অধ্যায়-১

উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি

উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ ঘটনা। উত্তর আফ্রিকার আগলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত ও স্পেনের উমাইয়া খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে বিবি ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর বলে দাবি করতেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে ইতিহাসে "ফাতেমীয় খিলাফত" হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই খিলাফত প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা ছিল অপরিসীম এবং যিনি ওবায়দুল্লাহকে খিলাফতে বসাতে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করেন তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ী। মিসরে ফারাওদের পর ফাতিমীয়রাই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এটি ছিল শিয়াদের সর্বপ্রথম খিলাফত।

১. ফাতেমীয়দের পরিচয় ও ইতিহাস

হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তার সমর্থকরা শিয়া নামে পরিচিত হয়। ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদী নিজেকে হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী বিবি ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর হিসেবে ঘোষণা করেন।[১] ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল জাফর সাদেকের পুত্র ইসমাঈলকে ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করে আর অপর দল তার অপর পুত্র মুসা-আল-কাজিমকে ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করে। যারা ইসমাঈলকে ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করে তাদেরকে "ইসমাঈলিয়া" বলা হয়। এই ইসমাঈলীয় মতবাদে বিশ্বাসী নেতা হলেন ওবায়েদউল্লাহ আল-মাহদী। তাই তার খিলাফতকে "ফাতেমীয় খিলাফত" হিসেবে অভিহিত করা হয়। তারা ছিল সপ্তম ইমামে অর্থাৎ "সাবিয়া" বিশ্বাসী। আর মুসা-আল-কাজিমের অনুসারীরা দ্বাদশ

১. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, ঢাকা-২০০৮।

ইমামে অর্থাৎ "ইসনা আশারীয়া" বিশ্বাসী। সপ্তম ইমামে বিশ্বাসীরা ৭ সংখ্যা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। যেমন : ৭ জন নবী, ৭ জন ইমাম, ৭ জন মাহদী, ৭টি স্তর। আসলে সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী এ ইসমাঈলিয় সম্প্রদায়ের শিয়ারা প্রাচীন পিথাগোরাসের ব্যবস্থা অনুযায়ী সপ্তম সংখ্যাকে পবিত্র হিসেবে মনে করে। তাদের মতে, পরিত্রাণের ৭টি স্তর রয়েছে, যেমন- (১) সৃষ্টিকর্তা, (২) বিবেক, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) বিশ্ব সৃষ্টির ঘটনাবলি, (৫) মহাকাশ, (৬) সময় ও (৭) মানুষ এবং পার্থিব জগৎ।

তারা ইসলামের নিয়ম কানুনকে বাতিল বলে স্বীকৃতি দেয়। নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং অন্যান্য মৌলিক বিধানগুলি পরিত্যাগ করবার জন্য তারা তাদের অনুসারীদের বলত তবে তাদের মধ্যে লোক দেখানোর জন্য বা সামাজিক কানুন রক্ষার্থে ঐগুলি হালকাভাবে পালন করত।

২. ফাতেমীয় নামকরণ সম্পর্কিত বিতর্ক

ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদী আদৌ ফাতেমীয় বংশের লোক ছিলেন কি না তা নিয়ে ইতিহাসে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির ১০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত সুন্নী ও শিয়া আলিমদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি ফরমানের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন যে সমসাময়িক ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম হযরত আলী ও বিবি ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর ছিল না। আসলে তিনি ছিলেন দাইসান নামে ধর্ম বিরোধী (ইহুদির) বংশধর। ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার ১০২ বছর পর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার এ ঘোষণা ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যারা ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদীকে ফাতেমীয় বংশের বলে মনে করেন, তারা হলেন, ঐতিহাসিক মাকরিজি, ইবনে খালদুন, ইবন-উল-আমির প্রমুখ। আর যারা তাকে ফাতেমীয় বলে স্বীকার করেন না তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবনে খাল্লিকান, সুয়ুতি, ইবনে ইজারি প্রমুখ। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেক গবেষণা করে তাদেরকে ফাতেমীয় বংশের বলে মনে করেন। তবে তারা ফাতেমীয় বংশের ছিলেন কি না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৩. ফাতেমীয়দের উত্থান ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা

ফাতেমীয়দের উত্থান ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা একক নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এটা ছিল শিয়াদের বিভিন্ন নেতৃত্বের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের সোনালি ফসল। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

৪. জাফরের পৌরহিত্য লাভ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের ইমাম মোহাম্মদ আল মাকতুম পরলোকগমন করলে তার পুত্র জাফর পৌরহিত্য লাভ করেন। তাকে "হাবীব" আখ্যা দেওয়া হয়। নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এমেসার নিকটবর্তী "সালামিয়া" নামক স্থানে সদর দপ্তর স্থাপন করে ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিশর প্রভৃতি স্থানে জনমত সৃষ্টির জন্য প্রচারকদল বা "দায়ী" প্রেরণ করেন। উমাইয়াদের উৎখাত করবার জন্য তারা আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগদান করে এবং আব্বাসীয়রা খিলাফত লাভ করে তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। ফলে তারা ক্ষমতা দখল করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র চালায়। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য ধর্মীয় আন্দোলনের আশ্রয় নেয়।

৫. আবদুল্লাহ-বিন-মায়মুন

সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ-বিন-মায়মুন ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচারকার্য চালায়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রচার কার্যের জন্য 'দায়ী' নিযুক্ত করেন। তার প্রচেষ্টায় ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবদুল্লাহ-বিন-মায়মুনের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি দায়ীদেরকে (প্রচারকদের) নির্দেশ দিলেন সুন্নীদের কাছে গিয়ে খলিফাদের গুণগান করতে, শিয়াদের কাছে গিয়ে হযরত আলী (রা.) ও বিবি ফাতিমা (রা.) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে। ইহুদি আর খ্রিস্টানদের কাছে গিয়ে মুসলমানদের কঠোর সমালোচনা করতে। আবদুল্লাহ-বিন-মায়মুন প্রথম বসরায় ও পরে সিরিয়ার সালামিতে তার প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্রচারক দল পাঠান। প্রচারক দল ইসমাঈলকে গুপ্ত ইমাম ও আবদুল্লাহ-বিন মারমুনকে মাহদী হিসেবে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু তিনি তার উদ্দেশ্য হাসিলের আগেই ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর মুখে পতিত হন।

৬. আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ী

এরপর জাফর হাবীব তার এক সুযোগ্য শিষ্য আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীকে 'শিয়া' উপাধি দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। ৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় পৌছেন এবং নিজেকে মাহদীয় অগ্রদূত বলে প্রচার করেন। আফ্রিকার "কাহতামা" গোত্রের বার্বারদের মধ্যে তার প্রচার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং শীঘ্রই তিনি সেখানে নিজেকে শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

---

২. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২।

৭. ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীর আফ্রিকায় যাত্রা

৯০২ খ্রিস্টাব্দে জাফর মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র ওবায়দুল্লাহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীর শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে আফ্রিকায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ওবায়দুল্লাহ আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে আগলাবীয় শাসক জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯ খ্রি.) হাতে বন্দি হন।

৮. জিয়াদাতুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ

জিয়াদাতুল্লাহ তার রাজ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ওবায়দুল্লাহ বন্দি হবার ফলে আল শীয়ীর সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জিয়াদাতুল্লাহ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ৪০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আল শীয়ীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই বাহিনী ফাতেমীয়দের হাতে চরমভাবে মার খায়। সেনাপতি হারুনের নেতৃত্বে ৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদাতুল্লাহ আরো একটি সৈন্যবাহিনী ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে ব্যর্থ হন। শেষে ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদাতুল্লাহর ২০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে আল শীয়ী কাতাম গোত্রের সাহায্যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রাকাদা ও কায়রোয়ান দখল করেন। জিয়াদাতুল্লাহ পলায়ন করলে আগলাবীয় রাজ্য আল শীয়ীর দখলে এসে পড়ে[৩]।

৯. ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে খলিফা ঘোষণা

জিয়াদাতুল্লাহর পলায়নের পর আল শীয়ী বন্দি নেতা ওবায়দুল্লাহকে মুক্ত করেন। এরপর তিনি সাঈদ-বিন-হাসানকে (ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী) একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে শহরের রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘোষণা করেন, "ইনি তোমাদের প্রভু (ইমাম)"। তার পর ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আল শীয়ী কায়রোয়ানের মসজিদে সাঈদ-বিন-হাসানকে "মাহদী" ঘোষণা করেন। তিনি "ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী" উপাধি ধারণ করে ৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

১০. আল শীয়ীর হত্যা

সিংহাসনে আরোহণ করে মাহদী সন্দেহবশত আল শীয়ীকে হত্যা করে আরব রাজনীতির চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করেছিলেন।

---

৩. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২, প্রাগুক্ত।

১১. ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীর কার্যাবলি

[illegible] ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করেন এবং পরবর্তীতে সিসিলি, মাল্টা প্রভৃতি জয় করে তার ক্ষমতা আরো সুদৃঢ় করেন। তিনি ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১২. অন্যান্য ফাতেমীয় খলিফাগণ

মাহদীর পর এ বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য খলিফা ছিলেন আল মুইজ। তার সিংহাসনে আরোহণের ফলে খিলাফতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা ঘটে।

১৩. মিসর দখল

আল মুইজের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো মিসর দখল। তার সেনাপতি জহর ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিসর বিজয় করেন। তিনি মক্কা, মদীনাসহ বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার নামে খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। এসময়ে মুসলিমবিশ্বে তিনজন স্বাধীন খলিফা ছিলেন। এদের একজন হলেন ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজ দ্বিতীয়জন হলেন স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান এবং তৃতীয় জন হলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মুকতাদির।

১৪. ফাতেমীয় খিলাফতের পতন

আল মুইজের মৃত্যুর পর (৯৭৫ খ্রি.) ফাতেমীয় খলিফাগণ দুর্বল হতে থাকে। এ বংশ প্রায় ২৬০ বছর ক্ষমতাসীন ছিল। বংশের শেষ খলিফা আল আদীদের মৃত্যুর পর ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে গাজী সালা-উদ-দীন আইয়ুবী মিসরে 'আইয়ুবী বংশ' প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা শিয়াদের এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি। ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে তারা বিখ্যাত হয়ে আছে। এই শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীর অবদান ছিল অপরিসীম। তার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া আফ্রিকায় এ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতো কি না সন্দেহ।

অধ্যায়-২

ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদী

আগলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী ফাতেমীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীর প্রচারণায় ফাতেমীয় আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। তিনি ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে আফ্রিকায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু, ওবায়দুল্লাহ আগলাবীয় শাসক জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯ খ্রি.) কর্তৃক বন্দি হন। শেষে আল শীয়ী জিয়াদাতুল্লাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে ওবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে মুক্ত করে ফাতেমীয়দের প্রথম খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাতেমীয় রাজ্য শাসন করেন। ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খিলাফত স্পেনের উমাইয়া খিলাফত ও বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অনেক দিন ধরে টিকে ছিল।

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন আরোহণ

ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী সিরিয়ার সালামিয়াতে ২৬০ হিজরীতে (৮৭৩ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল হোসাইন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইমামরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।[১] এরপর তিনি তার চাচা সাঈদ আল খাইয়ের কন্যাকে বিয়ে করে সংগঠনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এরপর আগলাবীয় শাসক জিয়াদাতুল্লাহর পতনের পর তিনি ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

১. আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীর প্রাণনাশ

আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ী ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। তিনি কাহতামা গোত্রকে বলেছিলেন যে, সাঈদ-বিন-হোসেন

---

১. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২।

(ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী) হলো প্রতিশ্রুত "মাহদী"। তিনি অনেক মুজিজা দেখাতে সক্ষম। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এগুলোর কোনোটিই সত্য নয় তখন আল শীয়ী ওবায়দুল্লাহকে হটাবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। খলিফা মাহদী তা জানতে পেরে আল শীয়ীকে হত্যা করে তার বংশের ভিত্তিকে দৃঢ় করেন।

২. খারেজী বিদ্রোহ দমন

খারেজীগণ মাহদীয় শাসনকে অস্বীকার করে এবং মুহম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে আমির নিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মাহদী তাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং ৮,০০০ খারেজীকে হত্যা করেন।

৩. কাতামা বিদ্রোহ দমন

কাতামা গোত্রের সহযোগিতায় ওবায়দুল্লাহ উত্তর আফ্রিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিন্তু অচিরেই তাদের সাথে মাহদীর সংঘর্ষ বাধে। তারা আরব শাসন অস্বীকার করে কাদু (Kadu) নামে এক ব্যক্তিকে তাদের আমির নিযুক্ত করে। তাদেরকে দমন করতে কয়েকবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে শেষে শাহজাদা তাদেরকে দমন করেন[২]।

রাজ্য জয়

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো :

১. আল মাগরিব বিজয়

তিনি উত্তর আফ্রিকার স্পেনীয় উমাইয়াদের কাছ থেকে ওয়ান দখল করেন। এরপর ইদ্রিসীয়দেরকে পরাজিত করে তিনি মরক্কো হতে তাদের বিতাড়িত করেন। ফলে মাহদীর রাজ্য সীমা উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে সমগ্র আল মাগরিব ফাতেমীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

২. ত্রিপলী বিজয়

ত্রিপলীতে আরব ও বার্বারদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। ৯১১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপলীতে মাহদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি সে বিদ্রোহ দমন করেন।

---

২. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২, প্রাগুক্ত।

৫. মিসর আক্রমণ

পশ্চিমে রাজ্য বিস্তৃতির পর তার দৃষ্টি মিসরের ওপর পড়ে। মিসর দখলের উদ্দেশ্যে তার সেনাপতি বার্কা জয় করে ৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে সামুদ্রিক বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। বাগদাদের আব্বাসীয়বাহিনী ও মিসরের যৌথবাহিনীর নিকট মাহদীরবাহিনী সুবিধা করতে না পেরেও বহু ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে সক্ষম হন। ৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মাহদীর সেনাবাহিনী পুনরায় মিসর জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

১. ওমর-বিন-হাফসুনের সাথে সংঘর্ষ

মাহদী মনে মনে স্পেন জয়ের আশা পোষণ করতেন। সে-জন্য তিনি স্পেনের বিদ্রোহী নেতা ওমর-বিন-হাফসুনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[৩] কিন্তু, ৯১৭ খ্রি. ওমরের পতন ও মৃত্যুর ফলে তার সেই ইচ্ছার চির অবসান ঘটে।

২. কার্মাতীয়দের সাথে সম্পর্ক

৯৩০ খ্রিস্টাব্দে (৩১৭ হিজরী) কার্মাতীয়রা পবিত্র নগরী মক্কাতে ঢুকে পড়ে এবং বহু হজ্জ্ব যাত্রীদের হত্যা করে। তারা পবিত্র কাবার ওপর চড়াও হয়। হজ্জ্বযাত্রীদের লাশ দিয়ে তারা জমজম কূপ ভর্তি করে ফেলে। কাবা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং পবিত্র হজরে আসওয়াদ নিয়ে যায়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার আমির বেগকিম কারমাতীয়দের কাছে ৫০,০০০ হাজার দিনারে পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন যাতে তারা হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করে। আব্বাসীয় খলিফারা তখন এতই দুর্বল ছিল যে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ফাতেমীয় খলিফা ওবায়েদ উল্লাহ আল-মাহদী কারমাতীয়দের কাছে এক পত্রে হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেবার জন্য বলেন। যদিও ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদীর কথা কারমতয়িরা রেখেছিল এবং হজরে আওয়াদ ফেরত দিয়েছিল ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তখন ছিল ফাতেমীয় খলিফা মনসুরের রাজত্বকাল।

---

৩. "উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস" এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২, পূর্বোক্ত।

মাহদীর কৃতিত্ব বিচার

১. সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
তিনি ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বহু বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা দমন করে তিনি একে সু-দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যান। তার প্রতিষ্ঠিত এই খিলাফত ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৬২ বছর টিকে ছিল।

২. দূরদর্শী রাজনীতিবিদ
তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। আবু আবদুল্লাহ আল শীয়ীকে হত্যা করে তিনি দূর দর্শিতার পরিচয় দেন।

৩. সাংগঠনিক দক্ষতা
তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি লক্ষ করলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা একজন মাহদী অপেক্ষা একটি শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থাই কামনা করে বেশি। তাই তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

৪. সামরিক সংস্কার
তিনি সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন। তিনি সৈন্যদেরকে নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া স্পেনের উমাইয়া এবং বাগদাদের আব্বাসীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তিনি গ্রিকদের সাহায্যে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন।

৫. বিজেতা হিসেবে
বিজেতা হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি মরক্কোর ইদ্রিসীয় রাজ্য এবং স্পেনের ওরান প্রদেশ অধিকার করে তার রাজ্য সীমা বার্ধিত কনে। খারেজী বিদ্রোহ দমন করে তিনি তিহারেত অঞ্চল স্থায়ীভাবে দখল করেন। এছাড়া তার নৌবাহিনী মাল্টা, বার্কা প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হয়।

৬. কূটনীতিবিদ হিসেবে
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ ছিলেন। কাতামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে তিনি সিসিলীতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। এছাড়া তার সাথে স্পেনের বিদ্রোহী নেতা ওমর-বিন-হাফসুনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৭. স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে
তার সময়ে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তবে তার স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো "মাহদী নগরী" প্রতিষ্ঠা। তিনি ৯১৬-২০ খ্রিস্টাব্দে এ নগরটি নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী কঠোর হস্তে সমস্ত প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে ফাতেমীয় খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যান। উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি শুধু এ বংশের প্রথম শাসকই ছিলেন না, অন্যতম যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। P.K. Hitti বলেন, "He proved himsely of most capable ruler.". তার প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খিলাফত দ্বাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত টিকে ছিল।

He proved
He proved himsely of most capable ruler.

আল কাইম (৯৩৪
ফাতেমীয় খিলাফ
পুত্র আবুল কাশি
সিংহাসনে আরো
ছিলেন। ইতঃপূ
যথেষ্ট যোগ্যতার
নৌবহর প্রেরণ
হলো। এছাড়া
হস্তগত হয়। এ
মিসরের ইখদিস
সেখানে সাফল্য
ধারণ করলে অ
করেন। বার্বার
তারা বিভিন্ন সু
সাহায্যে বিদ্রো
করে একটি ব
তার সাথে যে
দখলে আসে।
তার এ সাফ
সাফল্যে উৎস
দিকে যাত্রা ক
বসেন। তিনি
পরাজিত হলে
অবরোধ করল

অধ্যায়-৩

আল-কাইম ও আল-মনসুর

আল কাইম (৯৩৪ খ্রি.-৯৪৬ খ্রি.)

ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়েদ উল্লাহ আল-মাহাদীর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল কাশিম 'আল কাইম' (স্থায়ী) উপাধি ধারণ করে ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার পিতার মতো উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি দু'বার মিসর আক্রমণ ও বার্বারদের বিদ্রোহ দমন করে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। ৯৩৪-৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপে এক নৌবহর প্রেরণ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্স ও ক্যালব্রিয়া মিসরীয়দের দ্বারা লুণ্ঠিত হলো। এছাড়া জেনোয়া অবরোধ করে তা দখল করে বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য তার হস্তগত হয়। এরপর তিনি মিসর দখল করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মিসরের ইখদিসীয় শাসকরা তখন ছিলেন বেশ শক্তিশালী। তাই ফাতেমীয়রা সেখানে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ইতোমধ্যে বার্বার বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলে আল-কাইম নিজ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করেন। বার্বাররা ফাতেমীয়দের ক্ষমতায় বসাতে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে আবু এজিদ নামে এক দরবেশের সাহায্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবু এজিদের লক্ষ্য ছিল, আরবদের বিতাড়িত করে একটি বার্বার রাজ্য গঠন করে খাঁটি ইসলামে ফিরে যাওয়া। খারেজিরাও তার সাথে যোগ দেয়। ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বাগাই, তাবাসা ও মারমাজেল্লা তার দখলে আসে। ফাতেমীয়বাহিনী আবু এজিদকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলো। তার এ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক গোত্র তার সাথে যোগদান করে। এত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দরবেশ এজিদ তার অনুগতদের নিয়ে কায়রোয়ানের দিকে যাত্রা করে পরাজিত হন। কিন্তু তিনি দমে না গিয়ে রাকাদা দখল করে বসেন। তিনি আবার কায়রোয়ানের দিকে যাত্রা করলন। এবার ফাতেমীয়রা পরাজিত হলো। খলিফা আল-কাইম মাহদীয়ায় আশ্রয় নিলেন। মাহদীয়া এজিদ অবরোধ করল। কাতামা, সানজাহা গোত্র ও জনগণ খলিফার সাহায্যে এগিয়ে

এলে এজিদ অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে যান। খলিফা আবার সমগ্র তিউনিসিয়া নিজ দখলে নিয়ে আসলেন। এজিদ কিছুদিন পর আবার সৈন্য সংগ্রহ করে দুমা অবরোধ করে বসলেন। ঠিক এ-সময় খলিফা আল-কাইম ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আল-মনসুর (৯৪৬-৯৫২ খ্রি.)

ফাতেমীয় খলিফা আল-কাইমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু তাহির 'আল-মনসুর-বি-আমরিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফতের আসনে আসীন হন। তিনি পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি দরবেশ এজিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। এজিদ এবার গুরুতরভাবে আহত হন এবং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। খলিফা আল-মনুসরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'আল-মনসুরীরা' নগরী প্রতিষ্ঠা। তিনি ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যায়-৪

আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)

ফাতেমীয় খিলাফতের ৪র্থ খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমীয় শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমসাময়িক কালের শাসকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব নীতি গ্রহণ করেন। তার এ দৃঢ় নীতির ফলে বিদ্রোহী গোত্রপ্রধান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্য বিদ্রোহীরাও তার আনুগত্য স্বীকার করেন। এর ফলে খুব সহজে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "চতুর্থ খলিফা মুইজের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই ফাতেমীয় বংশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।"

১. প্রাথমিক জীবন

আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমীয় খলিফা আল-মনসুরের পুত্র। আল-মুইজ ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২২ বছর বয়সে ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফতের আসনে আসীন হন।

২. দৃঢ়নীতি গ্রহণ

তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন, পুরাতন দুর্গগুলোর পুনঃসংস্কার করেন। তিনি নৌবাহিনীতে যুদ্ধ জাহাজ সংযোজন করেন। দেশের সার্বিক অবস্থা অবগত হবার জন্য এবং জনসমর্থন লাভের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে রাজকর্মচারী ও জনগণের প্রকৃত চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হন।

৩. বিদ্রোহ দমন

খারিজী ও বার্বাররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। ফাতেমীয় খলিফারাও এর থেকে রেহাই পায়নি। খলিফা আল মুইজ সুকৌশলে বিদ্রোহী নেতাদের আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

৪. মরক্কো বিজয়

আল-মুইজের সময়ে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত হয়। স্পেনের সিংহাসনে যখন তৃতীয় আবদুর রহমান আসীন তখন ফাতেমীয় নৌবহর স্পেন

উপকূলে অবতরণ করে। দুই শাসনকর্তার মধ্যে শত্রুতা কয়েক বছর ধরে চলছিল। আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মরক্কো অধিকার করে স্পেনিশ উপকূলে যুদ্ধাভিযান করে।

৫. ক্রীট দ্বীপ হস্তচ্যুত

স্পেন থেকে আগত মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরের এ দ্বীপটিতে এসে বসবাস করতে থাকে। ৮২০ খ্রিস্টাব্দে (২০৪ হিজরী) তারা এর শাসনভার গ্রহণ করে। এ দ্বীপটি সভ্যতার এত উন্নতি সাধন করে যে তা ইউরোপের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রিকরা এ দ্বীপটি দখলে তৎপর থাকে। এছাড়া আব্বাসীয়রা, মিসরের ইখসিদীয় সিরিয়ার হামদানীয়রা এ দ্বীপটি দখলের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। আল-মুইজ মিসর বিজয়ের ঘাটি হিসেবে এ দ্বীপটিকে ব্যবহার করবার জন্য তা খুব সহজেই দখল করে নেয়। কিন্তু গ্রিকরা ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে (৩৫০ হিজরী) ৭০০ যুদ্ধ জাহাজ ও বহু সৈন্য নিয়ে এ দ্বীপটি দখল করে নেয় দ্বীপবাসীদের ওপর গ্রীকরা প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। এ দ্বীপটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

৬. সিসিলি বিজয়

৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আহমদ-বিন-হাসানের নেতৃত্বে আল-মুইজের এক বিরাট নৌবাহিনী বাইজান্টাইনদের (গ্রীকদের) পরাজিত করে সিসিলি দখল করে নেয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমির আলী বলেন, "ক্রীট দ্বীপ হস্তচ্যুত হইলেও সিসিলীতে বাইজান্টাইন শক্তির নির্মূল সাধন দ্বারা ইহার কিছু ক্ষতিপূরণ সাধিত হইয়াছিল।"[১]

৭. মিসর বিজয়

ক. মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা

৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাফুর মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। এর মধ্যে ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নীলনদের পানি হ্রাস পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সাথে মহামারিও দেখা দিল। কেবল ফুসতাত এবং এর চার পাশেই ৬,০০,০০০ লোক মৃত্যুবরণ করল। বহু লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। রাজস্ব হ্রাস পেল, সৈন্যদের বেতন বাকি পড়ল। সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দেশে এক চরম অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হলো। এমন অবস্থায় মিসরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আল-মুইজকে মিসর আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

---

১. "আরব জাতির ইতিহাস" সৈয়দ আমীর আলী (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ), ঢাকা-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫০৫।

খ. আল-মুইজের মিসর আক্রমণ

তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আল-মুইজ তার বিখ্যাত সেনাপতি আবুল হাসান জওহর বিন আবদুল্লাহ সিকিল্লিকে ১,০০,০০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ১,০০০ উষ্ট্রারোহী এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও গোলাবারুদ দিয়ে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিসর দখল করার জন্য পাঠান।

গ. মিসর বিজয় সম্পন্ন

সেনাপতি জওহর প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় আগমন করলে সেখানকার নাগরিকরা আত্মসমর্পণ করে। এরপর জওহর ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিনা বাধায় মিসরের রাজধানী ফুসতাতে প্রবেশ করে মিসর বিজয় সম্পন্ন করেন।

ঘ. কায়রোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

ফাতেমীয় খলিফা আল-মুইজ আগেই একটি নতুন শহরের নকশা ঠিক করে দেন। সে অনুযায়ী সেনাপতি জওহর নদী থেকে প্রায় ১০০ ক্রোশ দূরে খুঁটি গেড়ে ১২০০ গজ দীর্ঘ একটি বর্গক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। এ খুঁটির সাথে দড়ি বেঁধে ঘন্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। মজুররা কোদাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন যখন সংকেত পাবে ঠিক তখনই তারা সবাই একসাথে প্রথম কোপ দিতে পারে। এদিকে জ্যোতিষীগণ 'শুভক্ষণ' নির্ধারণ করার জন্য বসলেন। কিন্তু এক দাঁড় কাক এসে সব কিছু পণ্ড করে দিল। কাক দড়িতে বসার সাথে সাথে সব ঘন্টা একসাথে বেজে উঠল। দৈবজ্ঞেরা বললেন, তখন আল-কাহেন অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ প্রবল, কাজেই বড় অশুভ লক্ষণ। কিন্তু কাকের কীর্তি সংশোধনের শক্তি কারো ছিল না। তাই নতুন নগরীর নাম হলো 'আল-কাহেরা আল-মাহফুজ' অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের রক্ষিত বিজয়ী নগরী। বর্তমান কায়রো এ 'আল-কাহেরারই' অপভ্রংশ। এ নতুন শহরের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে জওহর বিজয়ের বার্তা খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। আব্বাসীয় খলিফার নাম বাদ দিয়ে আমিরুল মুমেনিন আল-মুইজের নামে খুতবা পাঠ করা হলো, আনযা ও মুদ্রায় শিয়া মতের বৈশিষ্ট্য পৃথক বাক্যে সন্নিবেশিত হলো। জওহর বিবি ফাতিমার (রা) স্মরণার্থে বিখ্যাত আজহার মসজিদটিও নির্মাণ করেন। পরে খলিফা মুইজ একে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং কালক্রমে এটি 'আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক লেনপুল যথাযথভাবেই বলেন, "মিসর বিজয় তাঁর (আল-মুইজ) জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং মিসরকে একটি সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত করাই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন।" এ নগরটি ছিল কিল্লা বা দুর্গ। এর নির্মাণ কাজ ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং এর নির্মাণ কাজ ৯৭২ খ্রিস্টব্দে শেষ হয়। দুর্ভিক্ষে জর্জরিত লোকদের মধ্যে সবার

আগে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল সেনাপতি জওহরের প্রধান কাজ। তিনি খলিফার কাছে এ খবর পাঠালে খলিফা আল-মুইজ কয়েক জাহাজ খাবার পাঠান। এতে করে সাময়িকভাবে উপকার হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। সরকারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ২ বছর ধরে এ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি লেগে থাকল। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে বহু লোক মারা গেল। তাদের দাফন করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। অনেক লাশ নদীতে ফেলে ভাসিয়ে দিতে হলো। বহু প্রতিক্ষার অবসানের পর ৯৭১-৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে এ মহাদুর্যোগের অবসান হয়।

৮. কার্মাথিয়ানদের দমন (সিরিয়া সমস্যা)

ড. এম. আবদুল কাদের বলেন, "প্রাচীন মধ্য বা বর্তমান যুগে মিসর কখনও সিরিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল না।" দক্ষিণ সিরিয়া নামে মাত্রই ইহুদিদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্র হোসাইন ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি থেকে রমলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। আল মুইজের সেনাপতি জওহর হোসাইনের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে হোসানই পরাজিত ও বন্দি হন। তাকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়। এরপর জাফর দামেস্ক অধিকার করেন। এখানে প্রথম শিয়া মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে। কর্মাথিয়রা সেখান থেকে যৌথ কর আদায় করে আসছিল দামেস্কে থেকে। এখন তা বন্ধ হয়ে গেলে কার্মাথীয়রা ক্ষীপ্ত হয়ে যায় এবং ফাতেমীয়দের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কার্মাথিয়রা পবিত্র নগরী মক্কায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় এবং কাবা ঘর অবমাননা করে এবং কৃষ্ণ পাথর নিয়ে যায়। এতে মুসলিমবিশ্ব ফাতেমীদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। এমনকি কার্মাথিয়া সর্দার (কবির) হাসান ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার কাছে সাহায্য চান। আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতি (৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.) অবজ্ঞার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "কার্মাথিয়রা ও ফাতেমীয়রা দুইই আমার কাছে সমান।" কিন্তু, আব্বাসীয় খিলাফতের বুহাইয়া আমির ও হামদানিয়রা কার্মাথিয়দের সাহায্যের জন্য আবু তাগলিব হাসানের অধীনে সৈন্য পাঠান। বুহাইয়াদের কাছ থেকে প্রচুর সৈন্যবাহিনী ও অর্থ আসল। আবার অনেক আরব গোত্র হাসানের সাথে এসে যোগদান করে। তাদের সহায়তায় হাসান দামেস্ক দখল করে নেয়। দামেস্ক বিজয়ের পর হাসান আল জানাবী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। জাফর তখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জাফফায় হাসান রামলার পথে মিসরের দিকে এসে সুয়েজ ও আল আরিশা দখল করে নেয়। এরপর তিনি কায়রোর দিকে (অক্টোবর ৯৭১ খ্রি.) অগ্রসর হন। ফাতেমীয় খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর হাসানের আক্রমণ বাধা দেবার

দ্রুত রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কায়রোর সামনে একটি বিরাট খাল খনন করেন এবং শহরের প্রবেশ দ্বারে এক লৌহদ্বার স্থাপন করেন। হাসান রাজধানীতে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করেন। কার্মাথিয়দের অভিযানের মধ্যে খলিফা আল মুইজ ইবনে আব্বাসের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। এ বাহিনী তিউনিস অধিকার করেন। কার্মাথিয়া নৌবাহিনী হাসানের সাহায্যের জন্য তিউনিস পুনদখল করতে এসে ব্যর্থ হয়। ৫০০ জন বন্দি হয়। ওদিকে জাফরও ফিরে যায়। এ চরম পরাজয়ে কার্মাথিয়া নেতা হাসান আবার পূর্ণ উদ্যোমে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। সেনাপতি জওহর খলিফা আল-মুইজকে মিসরে এসে শাসন ভার নিজ হাতে নেবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন।

৯. আল-মুইজের মিসর আগমন

সেনাপতি জওহর খলিফা আল-মুইজকে মিসরে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কায়রো থেকে যাত্রা করে খলিফা ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সারদিনা ও সিসিলি দ্বীপ সফর করেন। তার পর তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে এসে উপস্থিত হন। রাজধানী কাহিরায় প্রবেশ করলে তার সম্মানে সেনাপতি জওহর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন। স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, আমির-ওমরাসহ খলিফা মুইজ নবনির্মিত রাজধানী কায়রোতে এসে উপস্থিত হন। খলিফা আল-আজহার-মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এরপর খলিফা রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন।

১০. ত্রিপোলি ও বার্কায় অভিযান

৯৭২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মুইজ তার রাজকীয় দফতর কায়রোয়ান থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত করেন। কায়রোতে সেনাপতি জওহরের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবার কারণে খলিফা তাকে ৯৭৩ পদচ্যুত করেন। এরপর কার্মাথীয়দের আবার আক্রমণের আশঙ্কায় তাদের সাথে আল মুইজ আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু এর কোনো সমাধান না হলে কার্মাথিয়রা বসন্তকালে হেলিওপেলিসে হাজির হয়। তাদের সাথে ইখশিদ বংশের দলের লোক ও আলী বংশীয়রা এসে যোগদান করে। তারা সম্মিলিতভাবে মিসরের সর্বত্র ব্যাপক ধ্বংস চালায়। আল-মুইজের পুত্র আবদুল্লাহ ৪,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের থামানো যাচ্ছিল না। তাই খলিফা কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তাই গোত্রের শেখ ছিলেন কার্মাথিয়দের প্রধান সহায়ক, আল মুইজ তাকে ১,০০,০০০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে নিজ দলভুক্ত করেন। রাজকোষে এত স্বর্ণ না থাকার কারণে সীসার ওপর সোনালি রং দিয়ে এ মুদ্রা তৈরি করা হয়। এ বিশাল অর্থের লোভে শেখ হাসানের পক্ষ ত্যাগ করলে হাসান চরম

বিপক্ষে পড়েন এবং তিনি পলায়ন করেন। হাসানের শিবির লুণ্ঠিত হলো এবং ১,৫০০ অনিয়মিত সৈন্য নিহত হলো। এভাবে খলিফা আল মুইজ সিসিলিতে ১০,০০০ হাজার সৈন্য পাঠান। হাসানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসঘাতকতা করে হাসানকে ফাতেমীয়দের হাতে ধরিয়ে দেন। ফাতেমীয় সেনাপতি হাসানকে বন্দি করে এক কাঠের খাঁচায় আটকিয়ে মিসরে প্রেরণ করেন।

১১. হাফতাকিনের বিদ্রোহ দমন

বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার রুহাইদ উজির মুইজ-উদ-দৌলার তুর্কি ক্রীতদাস হাফতাকিন ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে আলেপ্পো ও দামেস্ক অধিকার করে নেন। তার নৌবাহিনী মিসরের ফাতেমীয় বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। তাই খলিফা আল-মুইজ হাফতাকিনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্ব

১. শাসক হিসেবে

শাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি শাসন বিভাগকে ৬টি বিভাগ বা দপ্তরে ভাগ করেন। আর তা হলো :

ক. সাহিবুল কালামুল জালিন

সরকারি কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খলিফার কাছে পেশ করা তার কাজ ছিল।

খ. সাহিবুল কালামুন দাফিক

সৈন্য বিভাগের কার্যাবলি, বৈদেশিক বিষয়াদি এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি দেখাশোনা করতেন।

গ. দায়ী-আল-দায়াত

মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে ফাতেমীয় প্রচারণা ও বিভাগের কাজ ছিল। বাজার পরিদর্শনও এর কাজ ছিল।

ঘ. জায়েব সাহেব আল বার

রাজকীয় মেহমানদের দেখাশোনা করতেন।

ঙ. আফসার খারাজ

খারাজ আদায় ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব।

চ. কারারুল হুজরা

বেতন প্রদান ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব।

২. বিজেতা হিসেবে

বিজেতা হিসেবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্রোহ দমনে, মরক্কো বিজয়, সিসিলি বিজয়, মিসর বিজয়ে তার সামরিক যোগ্যতার পরিচয় দেন। তার সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিবৃত লাভ করে।

৩. স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক

তিনি ছিলেন স্থাপত্যশিল্পের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি কায়রোর নকশা নিজেই তৈরি করেন। এ শহর নির্মাণে ৩ বছর লাগে। তার প্রাসাদে (বিরাট পূর্ব প্রাসাদ) ৪,০০০ কক্ষ ছিল, এতে তার স্ত্রী-পুত্র, কন্যাসহ ১৮,০০০ থেকে ৩০,০০০ হাজার লোক বাস করত।

৪. সামরিক সংস্কার

খলিফা আল-মুইজ সামরিকবাহিনীর ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। কারণ দেশ জয়ের প্রধান ছিল একটি শক্তিশালী সামরিকবাহিনী। এ উদ্দেশে তিনি নৌবাহিনীর ব্যাপক সংস্কার করেন। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল প্রধান নৌঘাঁটি।

৫. বিচার বিভাগ সংস্কার

ফাতেমীয় দায়ী বা প্রচারক দলই আইন ও বিচার দেখাশুনা করত। বিচার বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন নুমান। নুমানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল "মাজালিস" নামে ৮০০ বক্তৃতা ৮ খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা। এছাড়া পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন জনগণের নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ, পবিত্রতা, বাজারে ওজন ও পরিমাপ দেখা ইত্যাদি দেখার দায়িত্বে ছিল "মুহতাসিবের" ওপর। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ ও বিচারের জন্য "Court of the Mazalim" নামে আদালত ছিল। খলিফা স্বয়ং এ আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

৬. অর্থনৈতিক সংস্কার

প্রখ্যাত ইহুদি অর্থনীতিবিদ ইয়াকুব-বিন-কিল্লিসের পরামর্শে সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়। আগে খাজনা-ইজারা দেওয়া হতো। তিনি তা বন্ধ করে দেন। রাজস্ব বিভাগ সরকারের অধীনে আনা হয়। জমির ওপর নতুন নিয়ম চালু হলো। কঠোরভাবে সমস্ত বাকি খাজনা আদায় করা হলো। রাজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তনেও যথেষ্ট কড়াকড়ি হলো। ফলে রাজস্ব আদায় পূর্বের অপেক্ষায় অনেক বাড়ে। আমরা দেখি শুধু ফুসতাতেই প্রত্যহ, ৫,০০০ থেকে ১,২০,০০০ দিনার কর আদায় হতে লাগল। ইয়াকুব বিন-কিল্লিস আব্বাসীয় মুদ্রার পরিবর্তে নতুন ফাতেমীয় মুদ্রা চালু করেন।

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক

খলিফা আল-মুইজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন, "তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম পাশ্চাত্যের মামুন ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিক্ষার আরোহণ করে।"[২] তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণীদের সমাদর করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইয়াকুব-বিন-কিল্লিস, হুসান, জাফর-বিন-মনসুর, আল-ইয়ামান, কবি ইবনে হানি। খলিফা মুইজের প্রধান চিকিৎসক মুসা-বিন-গাজাল ছিলেন একজন ইহুদি আর সাদিক-বিন-বীতরিক ছিলেন একজন খ্রিস্টান।

৮. ধর্মীয় নীতি

খলিফা মুইজ ছিলেন একজন শিয়া। শুক্রবার, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, গাদিরে খুম ঈদ, ১০ মহররম, ১ রজব, নীলনদের বন্যা উৎসব, বসন্তের নওরোজ প্রভৃতি আনন্দ উৎসবগুলো ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে পালন করা হতো।

মৃত্যু

দীর্ঘ ২৩ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করবার পর আল-মুইজ ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নিঃসন্দেহে খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাকে মুসলিম পাশ্চাত্যের মামুন বললেও বোধ হয় কোনো ভুল হবে না। তিনি দেশ জয় করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যেকে এক চরম গৌরবের দিকে নিয়ে যান। তার রাজত্বকাল ছিল ফাতেমীয় খিলাফতের 'স্বর্ণযুগ'।

অধ্যায়-৫
আল আজীজ (৯৭৫-৯৯৬)

আল আজীজের রাজত্বকাল মিসরের ফাতেমীয় খিলাফতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার রাজত্বকাল (৯৭৫-'৯৬ খ্রি.) ছিল ফাতেমীয়দের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। তিনি উদারতা, সাহসিকতা, মহানুভবতা, ক্ষমা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলিতে বিভূষীত হয়ে ফাতেমীয় খিলাফতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা ও স্পেনের উমাইয়া খলিফার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার শাসনামলে ফাতেমীয় খিলাফত শক্তি ও গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তাই অধ্যাপক P.K. Hitti বলেন, "Of the Fatimid chliphs Al-Aziz was probaly the wieset and must beneficent."

পরিচয় ও সিংহাসন আরোহণ

আল আজীজ ৩৪৪ হিজরী (৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২৪ বছর বয়সে ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে (৩৬৫ হিজরী) ৫ম ফাতেমীয় খলিফা হিসেবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

১. সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন

খলিফা আল মুইজের শাসনামলে সিরিয়ায় ফাতেমীয় শাসন সুদৃঢ় হয়নি। ফলে আল আজীজ সিংহাসনে আরোহণ করে সিরিয়ার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।[১] এই সময় বিদ্রোহী কারমাথিয়ানরা তুর্কি নেতা হাফতাকীনের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে দামেস্ক হতে ফাতেমীয় শাসন কর্তাকে বিতাড়িত করে। তুর্কি নেতা হাফতাকিন বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার অনুগত ছিলেন এবং বুয়াইদ আমির আজুদ্দৌলাহর সময় আব্বাসীয় খলিফার তুর্কিবাহিনীর প্রধান পদে উন্নীত হন। উচ্চাভিলাষী হাফতাকীন বার্বার ও কারমাথিয়ানদের সহায়তায় সিরিয়ার ফাতেমীয় প্রতিনিধি ইবনে জাফরকে পরাজিত করে দামেস্ক দখল করেন। আল আজীজ এই সমস্যার সমাধানের জন্য

তার প্রধান সেনাপতি জওহরকে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী দিয়ে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হাফতাকিনের বিরুদ্ধে সিরিয়াতে পাঠান। হাফতাকিন ফাতেমীয়বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে সেনাপতি জওহরকে আম্রকাননে পিছু হটতে বাধ্য করেন। শেষে খলিফা আল আজীজ স্বয়ং সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে হাফতাকিনকে পরাজিত ও বন্দি করেন। পরে তাকে ফাতেমীয় দরবারে স্থান দেওয়া হয় এবং তাকে খলিফার তুর্কি দেহরক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

২. বার্বারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

আল আজীজের রাজত্বকালে বার্বারদের অসন্তোষ অব্যাহত থাকে। চঞ্চলমতি বার্বারদের ওপর খলিফার কোনো আস্থাই ছিল না। তুর্কিবাহিনী দ্বারা তিনি বার্বারদের দমন করলেও তুর্কিবাহিনী পরবর্তীতে ফাতেমীয় বংশ পতনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সাম্রাজ্য বিস্তার

তার রাজত্বকালে সমগ্র সিরিয়া ও মেসপটেসিয়ার কিয়দংশ ফাতেমীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। হিজাজ, ইয়ামেন ছাড়াও মসুল, আলেপ্পো, হামাসসহ অন্যান্য স্থানে তার নামে জুমআয় খুতবা পাঠের ব্যবস্থা হয়। এ-সময় ফাতেমীয় সাম্রাজ্য ফোরাত নদীর সীমা হতে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কৃতিত্ব বিচার

১. দক্ষ শাসক

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে লোকদেরকে রাজকার্যে নিয়োগ দান করে যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

২. রাজস্ব সংস্কার

তার ইহুদি মন্ত্রী ইয়াকুব-বিন-কিল্লিস মিসরের রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি সকল কর্মচারীর বেতন নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি কঠোর হস্তে ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান বন্ধ করেন।

৩. সৈন্যবাহিনী সংস্কার

তিনি তুর্কি দেহরক্ষীবাহিনী গঠন করেন। তিনি নৌপথকে উন্নত করেন। নতুন ইউনিট, দুর্গ এবং জাহাজ ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করেন। তিনি নৌবাহিনীর জন্য ঈসা-বিন-নেসতুরিয়াসের সহায়তায় তিন মাসে ৬টি নতুন রণতরী তৈরি করেন।

৪. বিচার বিভাগ

এ সময়ে ফাতেমীয়দের ইতিহাস প্রণেতা ধর্মীয় কানুন ও বিচার ব্যবস্থার [illegible] কাদির নুমানের পরিবার বিচার ও দাওয়া বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। নুমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলী-বিন-নুমান কাজীর পদ অলংকৃত করেন। জনগণ ন্যায়বিচার পেত। ধনী, গরিব সবার জন্য সমান বিচার ছিল।

৫. কূটনৈতিক সম্পর্ক

তিনি মনে মনে আশা পোষণ করতেন যে, আব্বাসীয় খলিফাকে বন্দি করে বাগদাদ থেকে কায়রোতে নিয়ে আসবেন। এ লক্ষ্যে তিনি বুয়াইয়া আমির আজাদউদ্দৌলার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এজন্য তিনি ২০ লাখ দিনার খরচ করে কায়রোতে একটি বন্দিশালা গড়ে তোলেন। তিনি স্পেন জয়ের আশাও করতেন। এজন্য তিনি কর্ডোভার খলিফাকে পত্র লিখলেন, "আমি অবিলম্বে স্পেন দখল অভিযান শুরু করব"। কর্ডোভার উমাইয়া খলিফা জবাবে লিখলেন, "আমাদের পক্ষে পূর্বে জানানো সম্ভব হয়নি বলে প্রস্তাবটি উপহাসের যোগ্য। কেননা, তা আমাদেরই শুনতে হলো, যদি আর কখনো শুনতে হয় তবে আমরা অবশ্যই প্রত্যুত্তর দিব।" এরপর তিনি স্পেন জয়ের আশা ত্যাগ করেন।

৬. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

তিনি পরধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইসলামে দীক্ষিত ইয়াকুব-ইবনে-কিল্লিস নামে এক ইহুদি। কিল্লিসের মৃত্যুর পর ইসা-বিন-নাসতুর নামে একজন খ্রিস্টান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

৭. ব্যবসা-বাণিজ্য

আল-আজীজের সময় ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে ফাতেমীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এ-সময় লোহিত সাগরের বাণিজ্য পথের ওপর তাদের অবস্থান কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং আব্বাসীয়দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকায় প্রাচ্য অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ফাতেমীয় প্রাধান্য অনুভূত হয়।

৮. ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক

তিনি জাঁকজমকের সাথে বাস করতে ভালোবাসতেন, জাঁকজমকের দিক দিয়ে তিনি তার পূর্ববর্তী সকল ফাতেমীয় খলিফাদের ছাড়িয়ে যান। তিনি দরবারে পারশিক ফ্যাশন অনুসরণ করেন এবং তার আমির-ওমরাও পারশিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। একবার তিনি ১২,০০০ পাউন্ড মূল্যে একখানা পারশিক

পর্যটক করেন। তিনি সর্বদা অতি আশ্চর্য জীবজন্তু, বিরল মণিমুক্তা ও হীরক খণ্ড সংগ্রহ করতে উৎসাহী ছিলেন। তার মতো তার মন্ত্রী ও উজিরাও জাঁকজমক পছন্দ করতেন। ইবনে কিল্লিস বেতন পেতেন ১০০০০০ দিনার। ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে যখন ইবনে কিল্লিস মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি এক বিশাল সম্পত্তি রেখে যান। তার মৃত্যুতে খলিফা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। তিনি তিনদিন ধরে কাউকে দেখা দেননি। ১৮ দিন সরকারি কাজকর্ম বন্ধ ছিল। এক মাস ধরে রাজকীয় খরচে দিন রাত তার সমাধিতে প্রশংসাগাথা আবৃত্তি ও কুরআন পাঠ করা হয়। অথচ ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সেনাপতি জওহর মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ৫০০০ দিনার তার পরিবার খলিফার কাছ থেকে পান।

৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

তার সময়ে আলী ও মুহম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় আইনের ও দাওয়ার ওপর অনেক গুলি মূলবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজে কবিতা পছন্দ করতেন এবং তা আবৃত্তি করতেন।

১০. স্থাপত্য শিল্প

খলিফা আল আজীজের স্থাপত্য কীর্তি ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি খিলাফতের সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। সোনালি প্রাসাদ, মুক্তাভবণ, কুরাফা সমাধী ক্ষেত্রে মায়ের নামে মসজিদ প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি।

মৃত্যু

খলিফা আল-আজীজ ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে (৩৮৬ হিজরি) সিরিয়াতে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হবার কারণে তিনি কাজি মুহম্মদ-বিন-নুমান ও সেনাপতি আবু মুহাম্মদ বিন-হাসান-ইবনে আম্মারকে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেন এবং তার ১১ বছরের একমাত্র পুত্র আল-হাকিমকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মেনে নিতে বলেন এবং সবাইকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য বলেন। দীর্ঘ ২১ বছর রাজত্ব করবার পর খলিফা আল আজীজ ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র

আল-আজীজ অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতার চেয়ে কোমলতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমির আলী বলেন, "বর্ণিত আছে যে, তিনি সদাশয়, সাহসী, জ্ঞানী, উদার এবং "শান্তি

শত্রুর প্রতি তাঁর অদ্ভুত ক্ষমা প্রবণ ছিলেন"[২]। এর প্রমাণ আমরা পাই বিদ্রোহী তুর্কী নেতা হাফতকিনকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে তিনি বরং তাকে তার মুক্তিসহ উচ্চপদ প্রদান করেন। এতে করে তার চরিত্রের মহত্ত্বের দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথেও সদয় আচরণ করেন। তিনি এক খ্রিস্টান রমণীকে বিবাহ করে ধর্মনিরপেক্ষতার এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে যান। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "বিশাল হৃদয়, সাহসী, কমনীয়, লোহিত কেশধারী নীল চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আরবদের রীতির সংস্কারক দক্ষ শিকারী, অকুতভয় সেনাপতি, সমঝোতায় বিশ্বাসী, শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমাকারী এবং রক্তপাত এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী আল আজীজ।"

খলিফা আল আজীজের রাজত্বকাল ফাতেমীয় খিলাফতের ইতিহাসে অন্যতম গৌরবময় যুগ ছিল। তার রাজত্বকালের শান শওকত, শান্তি-শৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা বিবেচনা করলে প্রশ্নাতীতভাবে একে ফাতেমীয় খিলাফতের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তার রাজত্বকাল বহু দিক দিয়ে আল মুইজের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনকালকেও ম্লান করে দিয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করেও হয়তো P.K. Hitti বলেন, "Though the golden age in the history of fatimid Egypt began with al-Muizz and culminated with al-Aziz."[৩]। তার রাজত্বকাল ফাতেমীয় খিলাফত প্রাচ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম রাষ্ট্রের গৌরব লাভ করেছিল।

---

২. "আরব জাতির ইতিহাস" সৈয়দ আমীর আলী (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ), ঢাকা-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫০৭।

৩. "আরব জাতির ইতিহাস" ফিলিপ কে. হিট্টি (অনু. জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত), কোলকাতা-২০০৩।

অধ্যায়-৬

আল হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রিস্টাব্দ)

ফাতেমীয় খলিফা আল-আজীজের মৃত্যুর পর আল-হাকিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার কতিপয় নীতির কারণে তাকে "পাগলা হাকিমও" বলা হয়ে থাকে। তিনি ফাতেমীয় খিলাফতের ষষ্ঠ খলিফা ছিলেন। তিনি পাগলা খলিফা হলেও বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের তৈরি "বায়তুল হিকমাকে" পুনঃ করে দেওয়ার জন্য "দারুল হিকমা" নামে একটি জ্ঞানমন্দির নির্মাণ করে জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেন।

১. পরিচয়

আল হাকিম ছিলেন ফাতেমীয় খলিফা আল আজীজের খ্রিস্টান স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আল-হাকিম জন্মগ্রহণ করেন।

২. সিংহাসন আরোহণ

৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা আল-আজীজের মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে আল-হাকিম ফাতেমীয় খিলাফাতে আসীন হন এবং শিয়াদের ইমাম হিসেবে স্বীকৃত হন। নাবালক অবস্থায় হাকিম সিংহাসনে বসলে তার অভিভাবক হন বারজোয়ান।

৩. আল-হাকিমের সমস্যাবলি

খলিফার নাবালকত্বের সুযোগে উচ্চাভিলাসী উত্তর আফ্রিকার বার্বাররা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উত্তর আফ্রিকার কাতামা গোত্রের বার্বার সেনাপতি প্রধান উজিরের পদটি দখল করে নেন। তিনি ঈসা-বিন-নেসতুরিয়সকে অপসারণ করে সচিবের পদটিও দখল করে "আমিন-উদ-দৌলা' উপাধি নিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই বার্বার গোত্ররা উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সবচাইতে বড় অবদান রাখে। ফাতেমীয়রা একটা ভুয়া ধর্মীয় নীতির সাহায্যে ফাতেমীয় খিলাফতের অধীনে আসীন হন। বার্বাররা ফাতেমীয়দের ক্ষমতা থেকে সরাবার চক্রান্ত করতে থাকে। আল-হাকিমের অভিভাবক বারজোয়ান সিরিয়ার শাসনকর্তা মানজু তাকিনকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার জন্য জানান। মানজু তাকিন একজন তুর্কি ছিলেন। তিনি তুর্কিদের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অচিরেই বারজোয়ানের সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

৪. আল-হাকিমের নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ

খলিফা আল-হাকিমের অভিভাবক বারজোয়ান তরুণ খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ধীরে ধীরে খলিফা সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি তার বিরুদ্ধে যেসব আমির, উজির, রাজকর্মচারীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তিনি তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। তিনি তার অভিভাবক বারজোয়ানকে হত্যা করেন। বারজোয়ানের হত্যার পর খলিফা নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

৫. খলিফার নতুন আইন প্রবর্তন

নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণের পর খলিফা দেখলেন যে, মিসরে পুনরায় দাঙ্গা দেখা দেয়। খলিফা দৃঢ় হস্তে এসব বিশৃঙ্খলা দূর করেন। এরপর খলিফা বেশ কয়েকটি নতুন আইন প্রবর্তন করেন। যেমন–

(ক) খলিফাকে আমাদের মালিক, প্রভু ইত্যাদি খিতাবের পরিবর্তে শুধু "আমিরুল মুমিনীন" বলে সম্বোধন করতে হবে।

(খ) দিনের বেলার পরিবর্তে রাতের গুরুত্ব অধিক প্রদান। মন্ত্রি বা উপদেষ্টাদের মিটিং রাতে করতে হবে।

(গ) খলিফা রাতে ধর্মীয় নেতাদের সাথে মিলিত হতেন এবং আব্বাসীয় খলিফা হারুন-আর-রশীদের মতো নগরে ভ্রমণের জন্য বের হতেন।

(ঘ) কৃত্রিম আলোয় রাস্তাগুলি আলোকময় করা হতো এবং দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই রাতে খোলা রাখার এবং ক্রয় বিক্রয়ে নির্দেশ দেন।

(ঙ) সকল বিপনি বিতান ও গৃহগুলিতে আলোক সজ্জার প্রতিযোগিতা লেগে যেত। পুরনো ফুসতাত নগরী আর নতুন কায়রো যেন আলোর মেলায় ঝলমল করত। লোকজন নৈশ ভ্রমণ বিলাসিতায় পরিণত হতো। এর ফলে কিছু নৈতিকতা বিরোধী কাজের জন্ম দিল। খলিফা মহিলাদের রাতে ঘর থেকে বের না হবার জন্য নির্দেশ দেন। জুতা প্রস্তুতকারীদের প্রতি খলিফা নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মহিলাদের বাহিরে যাবার জন্য কোনো জুতা না প্রস্তুত করে।

(চ) মদ নিষিদ্ধ করা হলো। মদের পাত্রগুলো ভেঙে একেবারে চুরমার করে ফেলা হলো। মদের যে কোনো ব্যবস্থার শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হলো।

(ছ) শূকর, কুকুর নিধন করা হলো।

(জ) উত্তম ষাড় জবাই নিষিদ্ধ হলো। একমাত্র কোরবানীর উৎসব ছাড়া।

(ঝ) জুয়া এবং এ জাতীয় ধর্মবিরুদ্ধ খেলাধুলা এবং অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করা হলো।

(ঞ) ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় নিদর্শন ঘন্টা ও ক্রুশ পরা বাধ্যতামূলক করা হলো।

৬. আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ

খলিফার আইন অমান্যের অপরাধ মৃত্যুদণ্ড হিসেবে ঘোষিত হলো। তবে রাতের কাজকর্মের আদেশ বেশ পরে রহিত করা হয়।

৭. আবু রাকওয়ার বিদ্রোহ দমন

খলিফা হাকিমের জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুযোগ নিয়ে আবু রাকওয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এজন্য খলিফা উজির হোসেন-বিন-জওহরকে সন্দেহ করেন। তাকে পদচ্যুত করে হত্যা করেন। স্পেনের উমাইয়া শাসনের শেষের দিকে জনগণ উমাইয়া রাজকুমার ওয়ালিদ বিন-হিশাম উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেন। তিনি দরবেশের ছদ্মবেশ নিয়ে মিসর, সিরিয়া, মক্কা, ইয়েমেন ও মাগরিব সফর করেন। ওয়ালিদ ফাতেমীয়দের শত্রু জানা সত্ত্বেও গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এখানে তিনি আবু রাকওয়া নাম গ্রহণ করে সীমান্ত শহর বারাক্কা দখল করেন। প্রধান উজির হোসেন ও প্রধান কাজী আবদুল আজীজ-বিন-মুহম্মদ-বিন-নুমানের গোপন সমর্থন লাভ করেন। এ খবর পেয়ে খলিফা তাদেরকে পদচ্যুত করেন। খলিফা বিদ্রোহ দমনের জন্য ১০১০ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু, খলিফার বাহিনী পরাজিত হলে খলিফা তার সুযোগ্য সেনাপতি ফজল-বিন-হাসানের নেতৃত্বে এ বিদ্রোহ দমন করেন। আবু রাকওয়াকে হত্যা করা হয়।

৮. খলিফার প্রশাসনিক পরিবর্তন

আবু রাকওয়ায় বিদ্রোহ দমনের পর খলিফা প্রজাদের প্রতি খুব সদয় হন। তিনি তার পূর্ববর্তী বহু কঠোর আদেশ শিথিল করে দেন। সুন্নী মুসলমানরা খলিফার প্রতি কোনো প্রকার সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ খলিফা আযানে "হাইয়া আলাল ফালাহ" "কল্যাণের জন্য এসো" এ শব্দটি বাদ দিয়ে দেন। অবশ্য পরে ১০০২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় আযানে তা ব্যবহার করা শুরু হয়। এ-রকম বহু মস্তিষ্ক বিকৃত পাগলামী সিদ্ধান্ত নেন খলিফা হাকিম।

৯. হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর কবর তুলবার ষড়যন্ত্র

একবার খলিফা একটি মারাত্মক ভুল পরিকল্পনা নেন। আর তা হলো-খলিফা গোপনে এক দূত প্রেরণ করেন যে, খেলাফায়ে রাশেদীনের খলিফা ও মহানবী

(স.)-এর চিরসঙ্গী সহচর হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর কবর মদিনায় মহানবী (স.)-এর পাশ থেকে তুলে এনে কায়রোতে নিয়ে আসতে।[1] মদিনা মসজিদের পাশেই একজন আলী বংশীয় থাকতেন। দূতরা গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নেন এবং সে বাড়ি হতে সুরঙ্গ পথ খুঁড়ে লাশ অপহরণের চেষ্টা করেন। এমন কার্য চলা অবস্থায় অকস্মাৎ প্রবল বেগে ঝড় শুরু হয়ে গেল। মদিনাবাসীরা আতংক গ্রস্ত হয়ে মদিনা মসজিদে ও পবিত্র রওজায় আশ্রয় নেন, ঝড়ের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। লোকজন মহা বিপদের মৃত্যু আসন্ন জেনে হতাশ হয়ে যায়। খলিফা আল-হাকিম প্রেরিত দূতরা এবং আশ্রয় দাতারাও ভয় পেয়ে যায়। অবশেষে তারা মদিনার গভর্নরের কাছে গিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা জানান এবং তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেন। গভর্নর তাদের শাস্তি প্রদান করেন। ঝড় থেমে যায় এবং জনগণের মনে শান্তি নেমে আসে। আসলে খলিফা আল-হাকিমের উদ্দেশ্য ছিল যে, এর মাধ্যমে কায়রোর সুন্নী মুসলমানদের-হৃদয় জয় করা। এটা যে কত বড় ধর্ম বিরোধী কাজ ছিল খলিফা সেদিকে কোনো নজরই দেননি। এটা ছিল তার বিকৃত মস্তিষ্কের এক বিকৃত পরিচয়।

১০. ইসলাম বিরোধী নির্দেশ

এরপর খলিফা আল-হাকিম আদেশ দেন যে, ফযরের নামাজের আযানে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" এ শব্দ বলা যাবে না। তবে "হাই আ'লাল ফালাহ" বলা যাবে। সালাতুজ জোহা আদায় করা যাবে না। রোজার সময় তারাবীর নামাজ পড়া যাবে না। ফুসতাস মসজিদের ইমাম খলিফার এসব আদেশ না মানলে তাকে হত্যা করা হয়।

১১. গজনীর সুলতান মাহমুদের কাছে পত্র প্রেরণ

১০১৩ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-হাকিম ভারত বিজয়ী গজনীর সুলতান মাহমুদের কাছে এক পত্র দেন যে, তিনি যেন খলিফার প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ এ পত্র দেখে এত বেশি ক্রোধান্বিত হন যে, সে পত্র ছিঁড়ে ফেলেন এবং সে পত্র থুথু দিয়ে তা পাঠিয়ে দেন বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার কাছে।

১২. আব্বাসীয় খলিফার ইসতেহার

আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ প্রখ্যাত সুন্নী ও শিয়া ইমামদের সাহায্যে এক ফতোয়া দেন যে খাতেমীয়রা হযরত আলী (রা.) ও বিবি ফাতিমা (রা.)-

এর হুমকির নয়। এটা ছিল মিসরের ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৩. খলিফা হাকিমের সুন্নীদের মন জয় করবার জন্য চেষ্টা

আব্বাসীয় খলিফার এ ফতোয়া জারির ফলে এক ফাতেমীয় খিলাফত যখন আব্বাসীয় খলিফার বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তখন ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম সুন্নীদের ক্রোধ কমাবার জন্য-খুতবা বা দেয়ালে বা সরাইখানার বা মসজিদে সুন্নী খলিফাদের বা ব্যক্তি বা সাহাবাদের বিরুদ্ধে লেখাগুলো যত আছে তা সব মুছে ফেলবার জন্য নির্দেশ দেন।

১৪. দারাজী বা দ্রুজ সম্প্রদায়

লেবাননের পার্বত্য এলাকায় ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ অদ্ভুত বিশ্বাস নিয়ে নিজেদেরকে খুবই শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। হাসান-আল-আখরাম নামে এক পার্শিয়ান ফারগানা হতে মিসরে এসে খলিফা আল-হাকিমকে "আল্লাহর গুণাবলিতে ভূষিত" করে তার মধ্যে "ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে" এটা ঢালাওভাবে প্রচার করতে শুরু করে। হাসান নামে এ বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন শিয়া মতবাদের উগ্রপন্থি। তিনি ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের সমস্ত পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন। একবার তিনি ৫০ জনের এক দল নিয়ে ফুসতাসের জামে মসজিদে এসে উপস্থিত হন। সেখানে তখন কাজী বিচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তখন হাসান কাজীকে একটি প্রশ্নের শুরুতে উচ্চারণ করে "বিসমি হাকিম আর রাহীম" অর্থাৎ "মহান খলিফা আল-হাকিম দাতা ও দয়ালুর নামে আরম্ভ করছি।" একথা কাজীসহ উপস্থিত সকলে হাসানের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যান যে, আল্লাহর সাথে খলিফা হাকিমকে তুলনা করবার জন্য। তখন উত্তেজিত জনতা হাসানের দলের কয়েকজনকে হত্যা করেন। কিন্তু কাফের হাসান পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। হাসানের দলের লোকেরা খলিফাকে আল্লাহর অবতার হিসেবে প্রচার করেন এবং তার আরাধনায় লিপ্ত থাকেন। হাসানের এমন ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইসলামকে রক্ষা করার জন্য একজন ঈমানদার সুযোগ বুঝে হাসানকে হত্যা করে। কিন্তু সে ঈমানদার ব্যক্তিকে হাসানের অনুরাগীরা হত্যা করে। হাসানের হত্যার পর দলের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করে হামজা-বিন-আলী-বিন-আহমদ হাদী। খলিফা আল-হাকিমের সাথে হামজার সাক্ষাৎ হয় এবং হামজার দ্বারা খলিফা খুবই প্রভাবান্বিত হন। এতে করে খলিফা নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মনে করতে থাকেন। খলিফা আল-হাকিম নামাজ, রোজা পরিত্যাগসহ লোকদেরকে হজ্জ্ব পালনের জন্য নিষেধ করেন। খলিফা কাবার গিলাফ প্রেরণ বন্ধ

করে দেন। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হাকিমই যে আল্লাহর সাক্ষাৎরূপ একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। খলিফা যখন রাস্তায় বের হতো তখন দারাজিরা মাটিতে সিজদা করে তাকে সম্মান করত এবং বলত "তুমিই আমাদের জন্ম ও মৃত্যু দাতা"। ইসলাম ধর্মকে খলিফা আল-হাকিম স্বীকার করতেন না। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই বলে খলিফা মনে করতেন। বর্তমানে লেবাননে এ দ্রুজ সম্প্রদায় রয়েছে।

১৫. স্থাপত্য কীর্তি

খামখেয়ালী, পাগল হলেও তিনি স্থাপত্যশিল্পে অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি তার পিতার অসমাপ্ত মসজিদ ১০০৩ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। তিনি মাসকাসে 'পরকালের মসজিদ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

১৬. দারুল হিকমা

আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বায়তুল হিকমাকে" ম্লান করে দেবার জন্য ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে "দারুল হিকমা" নামে একটি মানমন্দির অর্থাৎ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা-ব্যকারণ, সাহিত্য, কবিতা, তুলনামূলক আইন, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সব বিষয় নিয়ে এ শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে। খলিফা হাকিম এখানে জ্ঞানী ও গুণীদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। 'দারুল হিকমাতে' খলিফা একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার গড়ে তোলেন। এখানে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও নতুন নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হতো। খলিফা প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়শামকে যিনি ইউরোপে "আল হাজেন" নামে পরিচিত, তাকে এ বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাগারের দায়িত্ব দেন। সুন্নী পণ্ডিত আবু বকর-আল-আনতাকি, ঐতিহাসিক মুসাবীহি, বৈজ্ঞানিক আলী-বিন-ইউনুস এ দারুল হিকমার অন্যতম মনীষী ছিলেন।

১৭. মৃত্যু

খলিফা-আল-হাকিমের মৃত্যুর রহস্য নিয়ে ইতিহাসে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তিনি ১০২১ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তার বোন সিতার-উল-মুলুক তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করান। আবার দক্ষিণ মিসরে এক বিদ্রোহী গোপনে খলিফাকে হত্যার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, খলিফা ইসলামকে ধ্বংস করবার জন্য যে-সমস্ত কাজ করছিলেন তার প্রতিবাদ হিসেবে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ও আল্লাহর গৌরবকে চির অম্লান রাখবার জন্য তিনি খলিফাকে হত্যা করেন। খলিফা যখন নিজস্ব

বাহনে রাতের বেলা একাকী হিকমায় যান, তারপর আর খলিফা সেখান থেকে ফিরে আসেনি। সেখানে তার বাহনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খলিফার রক্তাক্ত পোশাক পাওয়া যায়। কিন্তু খলিফার মৃত দেহ আর পাওয়া যায়নি। দ্রুজী ও দ্রুজীরা মনে করে যে, খলিফা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তিনি আবার "মেসিয়া" বা "মাহদী" হিসেবে ফিরে আসবে। তার মৃত্যুর পর অনেক প্রতারক নিজেদের 'খলিফা হাকিম' হিসেবে প্রচার করে।

১৮. ফাতেমীয় খিলাফত পতনে খলিফা আল-হাকিমের ভূমিকা

ফাতেমীয় খিলাফত পতনে খলিফা আল-হাকিমের ভূমিকাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ তিনি মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান কারোরই সমর্থন আদায় করতে পারেন নি। তিনি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চালু করলে মুসলিম জনগণের সহানুভূতি হারান। তার সবচাইতে বড় অপরাধ হলো ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করে নিজেকে আল্লাহ হিসেবে ঘোষণা করা। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা শুধু হাকিমকে নয় বরং মিসর থেকে চিরতরে ফাতেমীয় খিলাফতের অবসান চান। খলিফা আল-হাকিম জেরুজালেমের বহু গির্জা ধ্বংস সাধন করে। ফলে খ্রিস্টান বিশ্বে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে শুরু হয়ে যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের "ক্রুসেড" বা "ধর্মযুদ্ধ"। খলিফা আল-হাকিম নিজের অজান্তে ফাতেমীয় খিলাফতের পতনের যে বীজ বপন করেন তা আর কখনো রোধ করা যায়নি।

১৯. খলিফা আল-হাকিমকে উন্মাদ, পাগল খলিফা বলার কারণ

পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহাসিকেরাই ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমকে উন্মাদ, পাগল, বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল-হাকিমের কতিপয় নীতি তাদের এ বক্তব্যকে জোরালো করেছে। খলিফা কোনো কারণ ছাড়াই যাকে তাকে হত্যা করতেন। এভাবে তিনি প্রশাসনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তার এ সমস্ত পাগলামীর জন্য ঐতিহাসিকেরা তাকে 'পাগল' শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

খলিফা আল-হাকিম ছিলেন ফাতেমীয় খিলাফতের অন্যতম খলিফা। তিনি পিতার মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখাতে পারেননি। তার উদ্ভট নীতির কারণে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। তিনি খামখেয়ালী শাসক ছিলেন। তিনি শিয়া গোঁড়াপন্থি ইসমাঈলীয়দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেকে আল্লাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে করে সমগ্র রাজ্যে এক বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে এত পাগলামী সত্ত্বেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অধ্যায়-৭

ফাতেমীয় খিলাফতের অনুকূলে আর্মেনীয় উজিরদের অবদান

মিসরে ফাতেমীয় খেলাফতের পতনের সময়ে আর্মেনীয় উজিররা ফাতেমীয়দের স্বার্থে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খলিফা আল-জহিরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুনতাসির বিল্লাহ মাত্র ১১ বছর বয়সে ফাতেমীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নাবালক খলিফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় আমির নিজেদের স্বার্থে ঘনঘন উজির পরিবর্তন করে থাকেন। কথিত আছে যে উজির আল-ইয়াকুবির মৃত্যুর পর ১০ অথবা ১৩ বছরের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৩ জন উজির পরিবর্তিত হয়। আবার দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ সমগ্র রাজ্যে মহামারি হিসেবে দেখা দেয়। রাজধানীতে তুর্কি, নিগ্রো ও অন্যান্য সৈন্যদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়। এমন অবস্থায় খলিফা আল-মুনতাসির টায়ারের শাসনকর্তা বদর আল-জামালিকে আহ্বান করেন তাকে সাহায্য করতে।

১. বদর আল-জামালির মিসরে আগমন

তিনি খলিফাকে লিখনের যে তিনি নিজস্ব সৈন্য নিয়ে আসবেন এবং তার আসার কথা যেন গোপন রাখা হয়। খলিফা তার শর্ত মেলে নিলে তিনি আর্মেনীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেন।

২. শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন

রাজধানীতে আগমন করে প্রথমেই বদর আল-জামালি কায়রোর গভর্নর হলদে গুজরকে বন্দি করেন। ১০৭৪ খ্রিস্টাব্দ বদর-আল-জামালি রাজধানীর অবশিষ্ট তুর্কি নেতাদের হত্যা করেন। তিনি তুর্কিদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে বিদ্রোহী তুর্কিপ্রধান ও সৈন্যদের দাওয়াত দেন। যখন ভোজের আয়োজন চলছিল, ঠিক তখনই তার নির্দেশে তার সৈন্যরা তুর্কি নেতাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন।

৩. মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

তার অসাধারণ কূটনৈতিক মেধা দেখে খলিফা তাকে মন্ত্রিত্বের পদ দেন। রাজধানীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে বদর-আল-জামালি প্রাদেশিক বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

৪. সামরিক অভিযান

তিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন এবং সমগ্র মিসরে ফাতেমীয় প্রভুত্ব কায়েম করেন। তুর্কিরা ১০৬০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম এবং ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক দখল

করে। বদর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার জন্য ... হয়। কিন্তু তিনি সিরিয়া দখল করতে ব্যর্থ হন। মিসরের ঘোর দুর্দিনে ... ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৫. মৃত্যু
১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

আফজাল
বদরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আফজাল তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খলিফা মুনতাসিরের মৃত্যু হলে আফজাল খলিফার বড় পুত্রকে সিংহাসনে বসান। এরপর খলিফার অপর পুত্র বিদ্রোহ করলে আফজাল সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করেন। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা জেরুজালেম ও আক্কা আক্রমণ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান প্রেরণ করেন। ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়।

আফজালের অবদান
ফাতেমীয় খলিফাতে আফজালের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি পিতার মতো দক্ষ ছিলেন। তার যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। তিনি স্বৈরাচারী নীতি কায়েম করেন। তিনি অনেক সংস্কার করেন। তিনি খাল খনন করেন, কৃষি কাজকে উৎসাহ দেন। তিনি 'জামিয়া-আর-রাশাদ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মৃত্যু
১১০১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুসতা আলীর মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র আমির খলিফা হন। কিন্তু সকল ক্ষমতা আফজালের হাতে থাকে। খলিফা যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে আবুল বরকতের অধীনে দাওয়া সংগঠন করেন। এতে করে খলিফার সাথে আফজালের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আফজাল দাওয়ার প্রধান কেন্দ্র 'দারুল ইলম' বন্ধ করে দেন। আফজালের ক্ষমতায় সন্দেহ পোষণ করে অনেকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয় এবং ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন।

পরবর্তী উজিররা
আফজালের মৃত্যুর পর খলিফা আমির গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হন। হাফিজ খলিফা হিসেবে ঘোষিত হন। সেনাবাহিনী উজির আফজালের পুত্র আবু আলী আহমদকে উজির হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি পিতার মতো দক্ষতা দেখান। কিন্তু ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি খলিফা হাফিজের ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন। মূলত তাদের ক্ষমতার মোহ ফাতেমীয় খেলাফতকে পতনের দিকে দ্রুত নিয়ে যান। তারা দীর্ঘ ৫৫ বছর ফাতেমীয় খেলাফতের উজিরের আসনে আসীন থাকেন।

অধ্যায়-৮

ফাতেমীয় খিলাফত পতনের কারণ

উত্থান, বিকাশ ও পতন পৃথিবীর এক চরম সত্য। এ সত্যে একদিন যেমন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসে হয়ে যায় ঠিক তেমনি অপরাপর সাম্রাজ্যের ন্যায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় খিলাফতের অবসান ঘটে। ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ খিলাফত প্রায় ২৬০ বছর রাজত্ব করবার পর ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে মহাবীর গাজী সালা-উদ-দীনের সময়ে চির পতন ঘটে।

ফাতেমীয় খিলাফত পতনের কারণসমূহ

ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পেছনে বহু কারণ বিদ্যমান ছিল। নিম্নে এর পতনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. ইবনে খালদুনের নীতিমালা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনকাল ১২০ বছর।[১] সাম্রাজ্যের জীবনকালও একই। যদি তাতে যুগ-সন্ধিক্ষণের অনুপাতে তারতাম্য ঘটে থাকে, তথাপি তা সাধারণভাবে তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না। এক পুরুষ ইবনে খালদুন ৪০ বছর করে ধরেছেন। তিন পুরুষের জীবনকাল হয় ১২০ বছর।

২. যোগ্য খলিফার অভাব

খলিফাদের অযোগ্যতা ফাতেমীয় খিলাফত পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ওবায়েদ-উল্লাহ-আল-মাহদী, আল-মুইজ, আল-আজীজের পর আর কোনো যোগ্য শাসক ফাতেমীয় খিলাফতের আসনে আসীন হননি।

৩. সুন্নীদের বিরোধীতা

ফাতেমীয় খিলাফত ছিল শিয়া মতাদর্শে উজ্জীবিত। এটা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র শিয়া খিলাফত। ফাতেমীয় খলিফারা অতিরিক্তভাবে শিয়া মতবাদ প্রচার করবার ফলে সুন্নীরা ফাতেমীয়দের নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া ফাতেমীয় অনেক খলিফা নামাজের আযানের পরিবর্তনসহ বহু ইসলাম বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। মূলত ফাতেমীয়রা ইসলাম ধর্মকে অপব্যাখ্যা করে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। ফলে সুন্নীরা তাদেরকে সুনজরে কোনোদিনই দেখেনি।

---

১. 'আল-মুকাদ্দিমা প্রথম খণ্ড' ইবনে খালদুন (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী) ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৩১৮।

৪. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ফাতেমীয় খিলাফত পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। যেমন কোনো খলিফা ৫ বছর, ৭ বছর অথবা ৯ বছর বয়সে অর্থাৎ শিশু অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। উজিরেরা তাদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়। ফলে ক্রমে উজিরদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা লেগে যেত তা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়।

৫. খলিফাদের অত্যাচার

ফাতেমীয় খলিফাদের অত্যাচার ফাতেমীয় খিলাফতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। আল-হাকিম কোনো কারণ ছাড়া প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা করেন। এছাড়া অন্যান্য খলিফারাও ষড়যন্ত্র করে হত্যার আশ্রয় নেয়। আবার খলিফা জহির (১০২১-১০৩৬ খ্রি.) নিষ্ঠুরতার এক চরম নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক আনন্দ উৎসবের ভোজের ব্যবস্থা করেন। আর এ আনন্দময় পরিবেশকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য খলিফা ২৬৬০ জন নারীকে আমন্ত্রণ জানান। তাদেরকে খাবার খাওয়াবার জন্য একটি মসজিদে নিয়ে গিয়ে মসজিদের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। তারপর বাইরে থেকে দরজা জানালাগুলোকে ইট দিয়ে গেথে একটি প্রাচীরের মতো করা হয়। মসজিদের ভিতরে অবস্থান করা ২৬৬০ জন নারীকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা হয়। দীর্ঘ ৬ মাস ধরে উক্ত মসজিদের দরজা খোলা হয়নি।

৬. বিলাসিতা

খলিফাদের বিলাসিতা ফাতেমীয় খিলাফতের পতনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। পরবর্তী খলিফারা ছিল অমিতব্যয়ী, বিলাসী। খলিফা জহিরের বিলাসিতার কোনো শেষ ছিল না। এসব বিলাসিতাই ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখে।

৭. খলিফা হাকিমের নীতি

খলিফা হাকিমের নীতি ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। তার ভুল, অদ্ভুত ও পাগলামী নীতি ফাতেমীয়দের চূড়ান্ত পতনের দিকে নিয়ে যায়। তার ভুলনীতির ফলেই সৃষ্টি হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ৩০০ বছর ধরে চলা 'ক্রুসেড' বা 'ধর্মযুদ্ধ'।

৮. সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন জাতির লোক

ফাতেমীয় সৈন্যবাহিনীকে কখনোই জাতীয় সৈন্যবাহিনী বলা যায় না। কারণ ফাতেমীয় সৈন্যবাহিনীতে আরব, বার্বার, তুর্কিদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কোনো জাতীয়তাবোধ ছিল না। এ জাতীয়তাবোধের অভাব ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখে। আর এ সেনাবাহিনীর ওপর দায়িত্ব ছিল জনগণের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এ সেনাবাহিনী জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার পরিবর্তে জনগণের জান-মালের হরণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঘরের মহিলারা তাদের জান ও ইজ্জত রক্ষা করবার জন্য ফ্রাঙ্ক তুর্কিদের কাছে আবেদন জানায়। ফলে ফাতেমীয় খিলাফতের পতন ত্বরান্বিত হয়।

৯. মতাদর্শের পরিবর্তন

ফাতেমীয়রা নিজেদেরকে ইসমাঈলীয় শিয়া হিসেবে দাবি করতেন। কিন্তু পরে তারা ইসমাঈলীয় নীতি থেকে সড়ে আসে। ফলে খলিফা মুনতানসিরের মৃত্যুর পর ফাতেমীয়রা দু'ভাগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। হাসান-বিন-সাবাহর (Old man of the mountain) নেতৃত্বে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তারা ফাতেমীয় খিলাফতের চরম বিরোধীতা করতে থাকে।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ ফাতেমীয় খিলাফতকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এতে করে বহু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। এক সময়ের ঐশ্বর্যশালী খলিফা মুনতানসিরের সময় (১০৩৫-১০৯৫ খ্রি.) দুর্ভিক্ষ এমন আকার ধারণ করে যে, দেশে মহা খাদ্য সংকট দেখা দেয়। স্বয়ং খলিফার মাতাসহ অনেকে ক্ষিধার তাড়নায় কায়রো ছেড়ে বাগদাদে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর খলিফা মুনতানসিনের অবস্থা হয়েছিল আরো করুণ। তিনি অত্যন্ত দীনহীন বেশে একটা কক্ষে বাস করতেন। দিনে মাত্র দুখণ্ড রুটি পেতেন। তাও আবার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ মহানুভব বাবশাদ খলিফাকে উক্ত রুটি দিতেন।

১১. তুর্কিদের দৌরাত্ম

ফাতেমীয় সেনাবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তুর্কিবাহিনী। তাদের দৌরাত্ম এমন আকার ধারণ করে যে, জনগণ তাদের প্রচণ্ড ভয় পেত। স্বয়ং খলিফারাও তাদেরকে ভয় পেতেন। খলিফা মুনতানসিনের সময়ে চলা দুর্ভিক্ষের সময়ও তুর্কিরা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চালায়। এটাও ফাতেমীয় খিলাফত পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

১২. নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন

ফাতেমীয় খিলাফত পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল খলিফাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। তারা হেরেমে দিন কাটাতো। খলিফা মুনতানসিনের চরিত্র

এত বেশি জাঁকজমক ছড়িয়েছিল যে, তিনি নিজ প্রাসাদের একটি ছিদ্রের ভিতর পবিত্র কাবার অনুকরণে তৈরি করেছিল এবং সুন্দরী গায়িকাদের গান শুনতেন ও মদ্যপান করতেন সেখানে বসে। তিনি বলেছিলেন, "কালো পাথরের দিকে তাকিয়ে মোয়াজ্জিনের গুণ গুণ শব্দ বা অতঃপর জল পান করার থেকে এ অনেক সুন্দর।"

১৩. ক্রুসেডারদের আক্রমণ

একাদশ শতাব্দির শেষে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম আক্রমণ করে ফাতেমীয়দের বিতাড়িত করবার পর জেরুজালেম দখল করে এবং মিসর আক্রমণের হুমকি দেয়। ক্রুসেডারদের আক্রমণ ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পেছনে ভূমিকা রাখে।

১৪. মুসলিম শাসকদের সাথে বিরোধ

বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কারণে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা ও স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের সাথে ফাতেমীয় খলিফাদের বিরোধ দেখা দেয়। ফাতেমীয় খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইজের সাথে স্পেনের উমাইয়া খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ বাধে। আবার ফাতেমীয় খলিফা মুনতানসিরের রাজত্বকালে ফাতিমীয়বাহিনী বাশাসিরির নেতৃত্বে বাগদাদ দখল করে। একবছর ফাতেমীয়রা বাগদাদ দখল করে রাখে। যদিও সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা তারা বাগদাদ থেকে পালাতে বাধ্য হয়। ফাতেমীয়রা বাগদাদ দখল করতে গিয়ে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, আর তা কখনোই ফিরে পায়নি। মূলত মুসলিমবিশ্বের দুটি খিলাফতের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তাদের বিপদের দিনে কোনো মুসলিম শাসক তাদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসেনি।

১৪. জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি

৯০৯ খ্রিস্টাব্দে যখন ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা বলে যে তারা হযরত আলী (রা.) ও বিবি ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর। আর ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদী হলো সেই প্রতিশ্রুত মাহদী। যিনি অনেক কারামত দেখাতে পারেন। যখন জনগণ তাদের মধ্যে এরূপ কিছুই দেখল না তখন জনগণের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আবার ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের সময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদের সুন্নী আব্বাসীয় খলিফা কাদির বিল্লাল সুন্নী ও শিয়া আলিমদের দ্বারা এক ইসতেহারে ঘোষণা করেন যে, ফাতেমীয়রা বিবি ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর নয়। এই ইশতেহার ফাতেমীয়দের প্রতি তাদের সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে তাদের চরম বিপদের দিনে জনগণ এগিয়ে আসেনি।

উজির শাওয়ারের কর্মকাণ্ড ফাতেমীয় খিলাফতের জন্য ছিল চূড়ান্ত মৃত্যুবরণস্বরূপ। তিনি ক্ষমতার লোভে ক্রুসেডারদের ও সিরিয়ার জঙ্গীদেরকে মিসর আক্রমণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তুর্কি সুলতান নুর-ইদ-দীন জঙ্গী তার সেনাপতি শিরকুহকে কায়রো অধিকার করবার জন্য পাঠান। সাথে আসেন গাজী সালা-উদ-দীন আইয়ুবী। শিরকু কায়রো দখল করে নেয়। এদিকে নিজের অবস্থা আরো পাকাপোক্ত করবার জন্য শাওয়ার তুর্কিদের হটিয়ে ফ্রাংদেরকে আমন্ত্রণ জানান। এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শিরকু শাওয়ারকে বন্দি করে হত্যা করেন। শিরকুহকে উজির পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু ২ মাস পর তার মৃত্যু হলে সালা-উদ-দীন উজির হন এবং নাবালক ফাতেমীয় খলিফা আল-আদিদের অভিভাবক নিযুক্ত হন। সালা-উদ-দীন ছিলেন সুন্নী মুসলমানের একজন মূর্ত প্রতীক। ওদিকে ফাতেমীয় খলিফা আদিদ গুরুতর অসুস্থ হলে খুৎবার ফাতেমীয় খলিফার পরিবর্তে বাগদাদের সুন্নী আব্বাসীয় খলিফার নাম পাঠ করা হয়। ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় শেষ খলিফা আল-আদিদ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সালা-উদ-দীন বিনা রক্তপাতে, বিনা বাধায় সমগ্র মিসরের অধিপতি হয় এবং এর সাথে ২৬০ বছরব্যাপী ফাতেমীয় খিলাফতের চির অবসান ঘটে।

উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি ছিল সর্বপ্রথম একমাত্র শিয়া খিলাফত। ইতিহাসের এক অমোঘ নিয়মে ২৬০ বছর পর এ খিলাফত ব্যবস্থার চির অবসান ঘটে।

অধ্যায়-৯

ফাতেমীয় শাসনামলে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মিসরে ফাতেমীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা

ওবায়েদউল্লাহ-আল-মাহদি কর্তৃক ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম তিউনিসিয়ায় ফাতেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরে ফাতেমীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য ফাতেমীয় খলিফারা উদ্যোগ দেন। দেশের নানারকম ব্যয় মেটানোর জন্য আয় বাড়ানো হয়। মিসর বিজয়ের পর সেনাপতি জওহর মিসরে ভূমি রাজস্ব দ্বিগুণ করেন। ফাতেমীয় খলিফারা ছিল সকল জমির মালিক। এ জমি তিনি যাকে খুশি দান করতেন। এ জামির ওপর কারো মালিকানা ছিল না।

খলিফা আল মুইজের সময়ে (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.) জমি জরিপ করা হয়। কর নির্ধারণ করা হয়। তাদের কর আদায়ের ভিত্তি ছিল কাবালা। (প্রদত্ত এলাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার চুক্তি)। ফাতেমীয়রা মিসরে কৃষিব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা করে। তারা জাতীয় সেচব্যবস্থা দরিদ্র কৃষকদের ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে দেশে প্রতিনিয়ত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজস্ব হ্রাস পায়। ঐতিহাসিক মাকরিজি এ ব্যবস্থার নিন্দা করেন। ফাতেমীয় খলিফা আল-আজীজের সময়ে (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.) কাবালা কৃষি নীতি গ্রহণ করা হয়। এ নীতিতে সেচব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কৃষকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো। কাজেই খুব অল্প দিনের মধ্যে মিসরে সেচব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, নীলনদের খাল ভরাট হয়ে যায়। খরা দেখা দেয় এবং বন্যা দেখা দেয়। চাষাবাদ হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে।

খলিফা আল হাকিমের সময় (৯৯৬-১০২১ খ্রি.) দেশের অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। তিনি এ সংকট মোকাবেলা করার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন—

ক. মদ উৎপাদন ও মদ খাওয়া নিষিদ্ধ,

খ. কায়রো নগরের চারপাশ হতে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ধ্বংস করা,

গ. লিউপনি নামক কলাই-জাতীয় উদ্ভিদ, ওয়াটারক্রেস নামক উদ্ভিদ এবং আইস ছাড়া একধরনের মৎস্য আহার নিষিদ্ধ এবং শিকারি কুকুর ছাড়া সব কুকুর হত্যার আদেশ দেন।[১]

তিনি ফাতেমীয় অর্থনীতি ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফাতেমীয় খলিফারাই প্রচেষ্টা চালান। ফাতেমীয়রা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করে। আফ্রিকার পণ্যসামগ্রী ছিল তাদের হাতের একদম মুঠোয়। ফাতেমীয়রা ভারত-মহাসাগরের বাণিজ্য পারস্য-সাগর ও লোহিত সাগরের দিকে আকৃষ্ট করার সব প্রচেষ্টা চালায়। ফাতেমীয়দের সাথে বাইজান্টাইনদের সংঘর্ষ থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের সাথে বাইজান্টাইদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং সিরীয় বন্দর দিয়ে সাইপ্রাসের মধ্য দিয়ে কনস্টান্টিনোপালের সাথে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। বাইজান্টাইনের নৌবহর কায়রোয় আসত।

সমাজব্যবস্থা

ফাতেমীয়দের সময় সমাজব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত ছিল না। কারণ, ফাতেমীয়রা ছিল শিয়া। তাদের কার্যকলাপ সুন্নিদের মন জয় করতে পারেনি। আবার সমাজের জনসাধারণের সাথে ফাতেমীয় খলিফাদের তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। সমাজে উঁচু শ্রেণির প্রধান্য ছিল বেশি। নিচে ফাতেমীয় সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

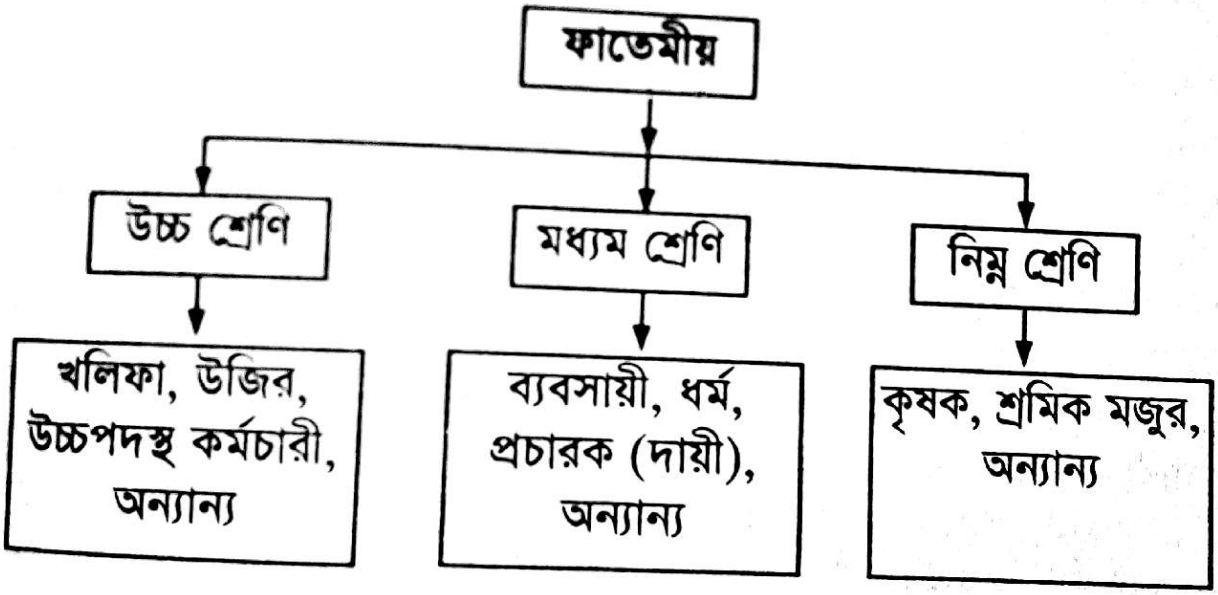

সমাজে মধ্যম শ্রেণি বলতে আমরা যা বুঝি, আসলে ফাতেমীয় আমলে তা ছিল না। আধুনিক সময়ের মতো মধ্য শ্রেণি এত সোচ্চার ছিল না। তারা সচেতন ছিল না। আর নিম্ন শ্রেণির দুঃখের সীমা ছিল না। ফাতেমীয় সমাজে ধর্মীয় মতপার্থক্য ছিল। নিচে ফাতেমীয় সমাজে ধর্মীয় স্তরব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ফাতেমীয় ধর্মীয় সমাজ

ফাতেমীয়রা ছিল শিয়া। তারা শিয়া ধর্মমতকে প্রাধান্য দেয়। অন্য দলের প্রতি চরম ধর্মীয় বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ফাতেমীয়রা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করে যে শেষপর্যন্ত তাদের এ বৈষম্যমূলক ধর্মীয় নীতিই অধ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফাতেমীয় সমাজব্যবস্থায় জনগণের কোনো বাক- ছিল না। খলিফার রায়ই ছিল চূড়ান্ত। এ সমাজব্যবস্থায় জনগণকে কোনো দেওয়া হতো না। ফাতেমীয় খলিফাদের সাথে জনগণের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। পতনের যুগে খলিফারা বিলাসব্যবসনে মগ্ন থাকতেন। জনসাধারণের কোনো খোঁজখবর নিতেন না। দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, লেগেই থাকত। এসব মহামারি থেকে জনগণকে সাহায্য ও সহযোগিতা কর খলিফারা করেনি। কাজেই তাদের বিপদের দিনে জনসাধারণ এগিয়ে আসে বরং তারা ফাতেমীয় শাসন অবসানের দিন গুণছিল।

ফাতেমীয় সমাজের সংস্কৃতি (সভ্যতা)

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফাতেমীয়রা অবদান রাখে। তারা বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে মানমন্দির নির্মাণ করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

ফাতেমীয় খলিফারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান করতেন। তারা ছিলেন সংস্কৃতিমনা। ফাতেমীয় খলিফাদের মতো তাদের উজিররাও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। ইবনে কিল্লিস প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আলেম, পণ্ডিত ব্যাকরণবিদদের সামনে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করতেন। কবিরাও তাদের কবিতা পাঠ করতেন। ফাতেমীয় যুগে মিসরে বিশ্ব-বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-কিন্দি (৯৬১ খ্রি.) ফোসতাতে বাস করতেন। কাজী নোমান ও তার পরিবারই ছিল প্রাথমিক ফাতেমীয় সময়ে সবচেয়ে বিখ্যাত লোক। নোমানের পরিবার ফাতেমীয় আইন প্রণয়ন করেন। ফাতেমীয় খলিফারা তার পরিবারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করত। খলিফা আল হাকিমের আরেকজন কর্মচারী আল মুসাব্বিহি ২৬০০০ পৃষ্ঠার 'মিসরের ইতিহাস' নামে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ফাতেমীয় খলিফাদের সময়ে বহু বিদেশি পণ্ডিত মিসরে আসেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ইবনুল হায়সাম, যিনি ইউরোপে 'আল-হাজেন' নামে পরিচিত। দার্শনিক মতবাদের কারণে তিনি নিজ দেশ ইরাক থেকে বিতাড়িত হয়ে মিসরে চলে আসেন। তিনি তার আলোক বিজ্ঞানের জন্য সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি চশমা আবিষ্কার করেন। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ফুসতাতে এই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন।

২. সাহিত্য চর্চা

ফাতেমীয়দের সময়ে সাহিত্যিকরা নিরাপদ ছিল না। প্রখ্যাত কবি গাফফার মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন। ফাতেমীয় কোনো কোনো খলিফা বিদ্যাচর্চার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

৩. গ্রন্থাগার

ফাতেমীয় খলিফাদের বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। এসব গ্রন্থাগারে লক্ষাধিক পুস্তক ছিল। এসব গ্রন্থাগারের কোনো তাকে কী কী গ্রন্থ আছে, তা একটি ক্যাটালগে লেখা ছিল। হাতে লেখা কোরআন ছিল ২৪০০টি, বিরাট আরবি অভিধান ৩০টি, ১২০০ খণ্ডে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারির নিজ হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি ফাতেমীয় লাইব্রেরিতে স্থান পায়। ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেতন বাকি থাকার কারণে তুর্কি সৈন্যরা ফাতেমীয় লাইব্রেরিতে তাণ্ডবলিলা চালায়। তারা অনেক মূল্যবান পুস্তক লুট করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ফেলে। আবার পুস্তক ছিঁড়ে ফেলা হয়। আবার কোনো কোনো পুস্তক বিদেশে চালান দেওয়া হয়। আবিষ্কারের কাছে একটি স্থান অনেক দিন ধরে 'পুস্তকের পাহাড়' হিসেবে পরিচিত ছিল। এত বিপর্যয়ের পরও যখন মহাবীর গাজী সালাউদ্দীন মিসরের ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি ফাতেমীয় সময়ে লাইব্রেরিতে ১,২০,০০০ কারো কারো মতে, ২,৬০০০০ কবি বই দেখতে পান।

৪. ঐশ্বর্য

ফাতেমীয় খলিফারা ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের সাথে থাকতে ভালোবাসতেন। খলিফা আল-মুইজের দুইকন্যা অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। মিসরে ফাতেমীয় খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী ছিলেন খলিফা আল মুনতানসির। ঐতিহাসিক মাকরিজি খলিফা মুনতানসিরের সম্পদের যে তালিকা দেন, তাতে বহু মূল্যবান বস্তুর কথা আছে। এসব মূল্যবান বস্তু তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। এসব লাগাম ছাড়া জীবন ও বিলাস-ব্যসনের মূল্য তাকে একদিন চরমভাবে দিতে হয়। তিনি ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী ও কন্যাদের অনাহারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের বাগদাদে পাঠিয়ে দেন।

৫. শাসনপ্রণালি ও সামরিকবাহিনী

ফাতেমীয়বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন—

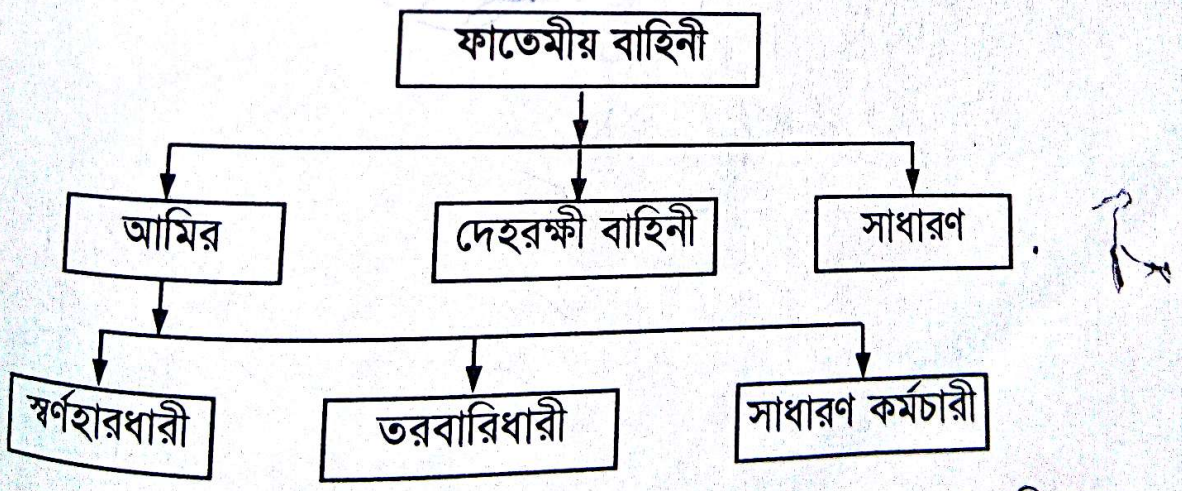

স্বর্ণহারধারীরা ছিল সর্বোচ্চ শ্রেণির। তরবারিধারীরা অশ্বারোহণে খলিফাকে এগিয়ে আনতেন। পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে ২০,০০০ ছিল উত্তর আফ্রিকার

কৃষ্ণকায় সৈন্য, ৬,০০০ হাবশী বা সুদানি, নিউবিয়ান প্রভৃতি, ১,০০০ তুর্কী ও সিরিয়ান, ৩,০০০ ক্রীতদাস ও ১,০০০ প্রাসাদরক্ষী। এসব উজির বা তাদের জাতির নামানুসারে হাফেজীয়া, গত্তসিয়া, রুমিয়া, স্লাভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হতো। তাদের বেতন দেওয়া হতো মাসিক ৮ দিনার। ফাতেমীয় নৌবহরে ৭৫টি দাঁড়টানা জাহাজ, ১০টি পালের ১০টি মালবাহী জাহাজ ছিল।

৬. চিত্রকলা ও কারুশিল্প

চিত্রকলা ও কারুশিল্পে ফাতেমীয় খলিফারা অবদান রাখে। তারা জীব চিত্র অঙ্কন করতেন, যা সুন্নি চিত্রশিল্পরা করতেন না। তারা নর্তকীদের অঙ্কন করেন, যা সুন্নি মুসলিমরা জীবনে কল্পনাও করতে পারেননি। চিত্রশিল্পের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন আল-কাসিম ও ইবনে আজীজ। তাদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। রাজ-পরিবারের লোকদের বস্ত্র জন্য আলাদা কারখানা ছিল। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট ফাতেমীয়দের ব্যবহৃত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন দেখতে পাওয়া যায়।